প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

ছত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ০২

ফেব্রুয়ারি ২০২১ ॥ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৭ ॥ জমা. সানি-রজব ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক

ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

সম্পাদক

মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই-মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

স ম্পা দ কী য়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

মানব জাতিকে মহান আল্লাহ তাআলা যেসকল নিয়ামত প্রদান করেছেন তার অন্যতম হল মাতৃভাষা। যুগে যুগে আল্লাহ তাআলার বাণী নবী রাসূলগণ তাদের উম্মতের কাছে মাতৃভাষার মাধ্যমেই পৌঁছে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা প্রেরিত বাণীসমূহ নবী রাসূলগণের স্বীয় ভাষার মাধ্যমেই প্রেরিত হয়েছে।

মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে সকল মানুষ তার দেশ জাতি সমাজকে উপলব্ধি করতে পারে। মাতৃভাষা তাই দেশপ্রেমেরও অন্যতম উৎস। মানবজাতির সভ্যতা বিকাশে মাতৃভাষা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পৃথিবীজুড়ে একটি জাতিগোষ্ঠী যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তার আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ সকল কিছুই মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রকাশ পায়। আর তাই আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মে মাতৃভাষার চর্চার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মহানবী রাসূল (সা) ছিলেন সেসময়ের সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী আরব। তার জীবনাদর্শের সর্বত্র তিনি দেশপ্রেম ও বিশুদ্ধ মাতৃভাষার চর্চার স্বাক্ষর রেখেছেন। পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনও বিশুদ্ধ ভাষার অন্যতম উদাহরণ।

ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই কালের বিবর্তনে অনেক ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অনেক ভাষা অন্য ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আবার গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে অনেক ভাষা তার স্বকীয়তা হারিয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে ভাষার ইতিহাস, ভাষা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

আমাদের মাতৃভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখি অনেক চরাই উৎরাই পার হয়ে আজকের পর্যায়ে পৌঁছেছে বাংলাভাষা। বাংলাভাষা এখন পৃথিবীর অন্যতম ভাষা। এই ভাষার ধ্বনি মাধুর্য যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন যুগে এ অঞ্চলে মাতৃভাষার চর্চাকে বন্ধ করারও অপচেষ্টা চলেছে। কিছু স্বার্থান্বেষী মহল তাদের কায়েমী স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত বা চরিতার্থ করার জন্য এই সকল অপচেষ্টা চালিয়েছেন। যার সঙ্গে ধর্ম, দেশ, জাতি সংস্কৃতির কোন রকম সংযোগ নেই। যারা এই অপচেষ্টা চালিয়েছেন তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। মাতৃভাষা বাংলা সগৌরবে তার স্থান দখল করে রেখেছে।

মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে সকল ভাষা সৃষ্টি করেছেন। তিনি একইসঙ্গে অসংখ্য জাতি মত পথও সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট সকল জাতিকে তিনি নিজস্ব চিন্তা ভাবনা শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষ্টিও প্রদান করেছেন। আর সকল কিছুই করেছেন মানবজাতিকে হেদায়েতের জন্য। তারা যাতে সঠিকভাবে মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগত, তার দেয়া কিতাব আল কুরআন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে পারেন সে ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

মহান আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে তার মর্যাদা রক্ষার জন্যই ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বুকে শহীদ হয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার সেই সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ আজ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃত। জাতিসংঘের ইউনেস্কোর মাধ্যমে ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ পৃথিবীর সকল ভাষাভাষি মানুষের সম্পদ। সারাবিশ্ব মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার এই দিনটি পালন করছে। পৃথিবীর সকল ভাষাভাষি মানুষ তাঁর মাতৃভাষার সকল কাজ সম্পাদন করার সুযাগ লাভ করলেই সার্থক হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আমরা প্রত্যাশা করি শুধুমাত্র উদযাপনের মধ্য দিয়ে নয় বাস্তব ক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল ভাষাভাষি মানুষ তার ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে দৈনন্দিন জীবনসহ সকল ক্ষেত্রে তাঁরা মাতৃভাষাকে যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করবেন।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ
মাওলানা রফিকুল আলম হামিদী
পবিত্র মাহে রমযানের প্রস্তুতি ◆ ০৯

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
কাজী আখতারউদ্দিন
ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ: বিবর্তনের গভীরতম রহস্য ◆ ১৬
মুফতী জুনাইদ আহমাদ
আসমানী ধর্মগ্রন্থসমূহের ভাষা ও মাতৃভাষা ◆ ২৪
মিলন সব্যসাচী
আজন্ম মাতৃভাষাপ্রেমী বঙ্গবন্ধু ও ভাষা-আন্দোলনের ইতিবৃত্ত ◆ ২৮
ফয়সাল আহমেদ
ভাষা আন্দোলন ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ◆ ৪৩

মুজিববর্ষ
লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রদত্ত
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ ◆ ৪৭

আন্তর্জাতিক
মূল : জাস্টিন প্যারোট
অনুবাদ : মুস্তাফা মাসুদ
পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে আল্লাহর অস্তিত্ব-প্রসঙ্গ ◆ ৫০
বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক
পাকিস্তানের এই ভয়ানক কর্ম দমন করবে কে ◆ ৬৫

বিশ্ব আন্তঃ ধর্ম সম্প্রীতি সপ্তাহ
নাজীর আহ্‌মদ জীবন
বিশ্বে আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ ও আন্তঃ ধর্ম সম্প্রীতি সপ্তাহ ◆ ৭০

ইতিহাস
আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী
সিলেটের গণভোট ও মাওলানা সহূল উছমানী (র) ◆ ৭৮

কবিতা

সোহরাব পাশা
বঙ্গবন্ধু : বাংলার স্বরলিপি ♦ ৯৫
শামসুল ফয়েজ
সুর-নির্ঝর অনুপম রবিশংকর ♦ ৯৬
রেজাউদ্দিন স্টালিন
সাপের সগতোক্তি ♦ ৯৭
সিরিয়া খান লোদী
অভিমান ♦ ৯৮
আবু মুসা চৌধুরী
চিত্রা হরিণীর মায়াবী চোখের ছায়া ♦ ৯৯
বদরুল হায়দার
সমতার গান ♦ ১০০
হাসনাত লোকমান
ভালোই আছি ♦ ১০১
সাদিক মোহাম্মদ
অমানবিক ♦ ১০২

গল্প

জব্বার আল নাঈম
বাবা ও বাংলা ভাষার গল্প ♦ ১০৩

স্মরণ

মঈনুল হক চৌধুরী
সৈয়দ মুজতবা আলী : বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ধ্রুপদী লেখক ♦ ১১২

শ্রদ্ধাঞ্জলী

গাজী সাইফুল ইসলাম
অধ্যাপক কবীর চৌধুরী : জাতীয় মননের বাতিঘর ♦ ১১৮

পরশমণি

আল-কুরআন

১। আপনি বলে দিন, আল্লাহর ফজল (অনুগ্রহ) এবং রহমত (দয়া) এর উপর তারা যেন খুশি উদযাপন করে। এটি তাদের অর্জিত সমুদয় সঞ্চয় হতে উত্তম। *(সূরা ইউনুস : ৫৮)*

২। স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমি কিতাব ও হিকমত যা কিছু তোমাদেরকে দান করেছি এরপর যদি তোমাদের নিকট এমন রাসূল আসেন যিনি তোমাদের কিতাবকে সত্যায়ন করবেন তখন তোমরা সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করেছ? এ শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তাঁরা বললেন, আমরা মেনে নিলাম। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। *(আলে ইমরান : ৮১)*

৩। তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন আর তোমরা তাঁর নিয়ামতের মাধ্যমে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে আর তোমরা জাহান্নামের উপকণ্ঠে উপনিত হয়েছিলে। তিনি সেখান থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা বুঝতে পার। *(আলে ইমরান: ১০৩)*

৪। আমি আপনাকে সমগ্র জাহানের জন্য কেবল রহমতস্বরূপই পাঠিয়েছি। *(সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৭)*

৫। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদেরকে ভাব প্রকাশ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। *(আর রাহমান : ৩-৪)*

আল-হাদীস

১। হযরত ইরবাদ বিন সারিয়া (সা) রাসূলে পাক (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর নিকট শেষ নবী হিসেবে লিখিত ছিলাম যখন আদম (আ) কাদা মাটির মাঝে মিশ্রিত ছিল। আর অচিরেই আমি তোমাদেরকে আমার প্রথম অবস্থা সম্পর্কে খবর দিচ্ছি। আমি হলাম ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফসল, ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের ঐ দর্শন যেটা মা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে তিনি আমাকে ভূমিষ্ঠ করেছেন এমতাবস্থায় তার থেকে একটি নূর বের হলো যা তাঁর সামনে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত করেছিল। *(সারহুস সুন্নাহ লিলবাগাভী, মিশকাত)*

২। হযরত আবু কাতাদা (রা) একদা তাঁকে প্রতি সোমবার রোযা পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তদুত্তরে তিনি বলেন, এ দিন আমার জন্ম হয়েছিল এবং এ দিনই আমার উপর ওহী নাযিল হয়েছিল। *(মুসলিম, মিশকাত-১৭৯)*

৩। হযরত কা'ব আহবার (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নিশ্চয়ই হযরত আদম (আ) ও অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টবস্তু একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সৃষ্টির কারণেই সৃষ্টি করা হয়েছে। *(বায়হাকী)*

৪। হযরত মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ করেন: আমার নিকট হযরত জিবরাঈল (আ) এসে আরজ করলেন, ইয়া মুহাম্মাদ! আল্লাহ পাক বলেছেন, আমি যদি আপনাকে পয়দা না করতাম তাহলে বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি করতাম না। *(মারফু সূত্র, দায়লামী শরীফ)*

৫। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি সে পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অপরাপর মানবমণ্ডলী থেকে অধিকতর ভালোবাসার পাত্র হবে না। *(বুখারী শরীফ)*

পবিত্র মাহে রমযানের প্রস্তুতি

মাওলানা রফিকুল আলম হামিদী

রজব চাঁদ উদয়ের মধ্য দিয়ে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রমযানের আগমন ধ্বনি সারা দুনিয়ায় ঘোষিত হয়। তাই রজব চাঁদ উদয়ের সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করতেন–

'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রাজাবা ওয়া শা'বান, ওয়া বাল্লিগনা রামাদান।'

অর্থ : ইয়া-আল্লাহ, আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসের বরকত দিন এবং রমযান পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছে দিন। উল্লিখিত হাদিস শরিফে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে এ হাদিসের মাঝেই রমযানের প্রস্তুতির উৎসাহ নিহিত রয়েছে। রজব ও শাবানের বরকত হলো–

* রমযানের প্রস্তুতিতে বরকত
* ইবাদাতে বরকত,
* তিলাওয়াতে বরকত
* সংযম ও সবরে বরকত,
* সর্বোপরি হায়াতে বরকত।

উল্লেখ্য যে, রজবের চাঁদ উদয় হতে শাবান মাসের শেষ পর্যন্ত রমযানে সকল প্রকার ইবাদত ও নেক আমলের জন্য দোয়া করাও রমযানের প্রস্তুতিরই অংশ।

ইবাদতের প্রস্তুতি

প্রকৃতপক্ষে রমযান হলো সমস্ত ইবাদতের ট্রেনিং পিরিয়ড। সারা বছর যারা নফল নামায, নফল রোযা, তাহাজ্জুত, ইশরাক, চাশ্ত, আওয়াবিনসহ নফল ইবাদাত তেমনভাবে করতে পারেননি এবং বিভিন্ন প্রকার গুনাহর কাজও ছাড়তে পারেননি, তাদের জন্য রজব শাবানের মধ্যেই রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। আর এগুলোই হলো রমযানের পূর্ব প্রস্তুতির অংশ। কোন কাজের পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া যেমন সফলভাবে কাজটি সম্পন্ন করা যায় না; ঠিক তেমনি রমযান মাসের ইবাদাতের পূর্বপ্রস্তুতি না থাকলে সঠিক ভাবে তা আদায় করা যায়না।

রমযানের ট্রেনিং পিরিয়ড হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা) শাবান মাসের শুরু হতেই প্রায় প্রতিদিন নফল রোযা রাখতেন। কিন্তু শাবানের শেষ সপ্তাহে তিনি রোযা ছেড়ে দিতেন এবং রমযান পালন করতে শারীরিক সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন।

মানসিক প্রস্তুতি

রমযান যেহেতু রহমত মাগফিরাত, ও নাজাতের মাস। তাই এ মাসের যাবতীয় হক আদায় করা অর্থাৎ বেশি বেশি ইবাদাত করা এবং সকল গুনাহের কাজ ছেড়ে দেয়ার কঠিন সাধনার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আর তা করতে হবে রমযানের চাঁদ উঠার আগেই অর্থাৎ রজব ও শাবান মাসে।

শারীরিক প্রস্তুতি

সামনে যেহেতু কঠিন সাধনার মাস রমযান, তাই রজব-শাবান এ দু'মাস এমন ভাবে কাটাতে হবে যেন কোনভাবেই অসুস্থ হতে না হয়। আর পূর্বে যারা অসুস্থ ছিলেন, রজব-শাবান এ দু-মাসের মধেই তারা দোয়া কালাম ও চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ সুস্থ করে দেবেন (ইনশাআল্লাহ)।

রজব ও শাবানের ফজিলত

রজব আল্লাহর, শাবান নবীজীর এবং রমযান হলো উম্মতের মাস। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ (সা) এক হাদিসে উল্লেখ করেছেন– রজব মহান আল্লাহর মাস। (কেননা এ মাসেই পবিত্র শবে মেরাজের মাধ্যমে নামায-রোযার নির্দেশ

নাজিল হয়েছে) এবং শাবান মাস আমার মাস, (কেননা এ মাসে রাসূলুল্লাহ সা. রাত-দিন অবিরত ইবাদতে কাটিয়ে রমযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন)।

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর কুরআনের মাধ্যমে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। নিম্নে তার আলোচনা করা হলো।

এক– দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ক্বিবলা পরিবর্তনের হুকুম আসে। হুজুর মক্কা থেকে ১৬-১৭ মাস বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছেন অতঃপর তার উপর কুরআনের আয়াত নাজিল হয় (আপনার চেহারা কা'বার প্রতি ফিরিয়ে নিন– বাকারা :১৪৪) এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অপার সম্মান এবং ইসলামের বিশেষ মর্যাদার প্রতীক। এমন একটি ঘটনা অন্য ধর্মে ঘটলে এদিনটিকে ঈদ হিসেবে ঘোষণা করা হতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে শুধুমাত্র দুইটি ঈদই নির্ধারিত হয়েছে। তবে ইসলামের ইতিহাসে (কেবলা পরিবর্তন) একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা পবিত্র শাবান মাসকে মহিমান্বিত করেছে।

দুই– রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাম ও দুরুদ পাঠের নির্দেশ সম্বলিত (সূরা আহযাবের-৫৬ নং) আয়াত নাজিল করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শানের সাথে শাবান মাসেরও সম্মান বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লিখিত দুই ঘটনা শাবান মাসের বিশেষ মর্যাদার কথাই প্রমাণ করে। 'এবং রমযান আমার উম্মতের মাস' (কেননা এ মাসের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশদিনে উম্মতের জন্য রয়েছে রহমত, মাগফিরাত এবং নাজাতের সুসংবাদ।

রজব ও শাবান মাসের হিসাব

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) শাবান মাসের যে পরিমাণ হিসাব রাখতেন অন্য কোনো মাসের এত হিসাব রাখতেন না। অতঃপর রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখতেন। যদি বিরুপ আবহাওয়ার কারণে চাঁদ দেখা না যেতো তবে শাবান মাস ৩০ দিনে গণনা করতেন, অতঃপর রোযা রাখতেন। (সুনানে আবু দাউদ : ২৩২৭)

রজব ও শাবানের কর্মসূচি

রজব-শাবান এ দুই মাস পবিত্র রমযানের প্রস্তুতির মাস। আর রমযান হলো ইবাদাতের মাস। তাই রমযানের যথাযথ ইবাদাত করার জন্য প্রথম হলো ইবাদাতের রুটিন। পারিবারিকভাবে ২৪ ঘন্টার একটি রুটিন তৈরি করতে হবে। রমযানে ইবাদাতের পাশাপাশি জরুরী কিছু কাজও থাকে। এক্ষেত্রে, পরিবারের সদস্য ও কাজের লোক সকলে মিলে কাজগুলো বণ্টন করে নিলে সকলের পক্ষে

ইবাদত করা সহজ হয়। এসময় অধীনস্থদের বোঝা হাল্কা করে দেয়াও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। বিশেষ করে রমযান মাসে আমরা কমবেশি সবসময়ই ইবাদাত করি। কিন্তু এ দু'মাসে রুটিন করতে হয় এই কারণে যে, রমযানে সারা বছরের মত ইবাদাত করলে রমযানের হক আদায় হয় না। কেননা রাসূল (সা) রমযান মাসকে ইবাদাতের মাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই এ মাসে নিত্যদিনের ইবাদাতের পাশাপাশি অতিরিক্ত নফল ইবাদাত করা প্রয়োজন। প্রতিদিন নফল নামায পড়া, কুরআন তেলাওয়াত, দুরূদ-শরিফ পাঠ ও ইসলামী বইপত্র পাঠের মাধ্যমে এ মোবারকময় সময় কাটানো উচিত। যার যার সকল পেশা ঠিক রেখেও এগুলো করা যেতে পারে।

তিলাওয়াত ও গবেষণার রুটিন

এ ব্যাপারে শুধু পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতই যথেষ্ট নয়। কুরআনের অর্থসহ তাফসীর, হাদিসের অর্থ সহ ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন মণিষীদের জিবনী গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও দর্শন সহ সকল প্রকার গবেষণামূলক বইপত্র অধ্যয়ন করতে হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনায় এই ধরনের বহু বই পুস্তক রয়েছে। এব্যাপারে

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের জন্যে এক মহা সম্পদ। বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য এ মহা জ্ঞানভাণ্ডার গ্রাম-গঞ্জ সহ প্রায় প্রতিটি মসজিদে ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে তৃণমূল পর্যন্ত কুরআন-হাদিসের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। যা সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ অবদান রেখে যাচ্ছে। অতএব, রোযাদার মুসুল্লিগণ এসব ইসলামী পাঠাগার থেকে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় বইপত্র পাঠ করে ইসলামের আলোতে আলোকিত হতে পারেন।

রমযানের পূর্বেই নিষিদ্ধ কাজসমূহ বর্জন

রোযা শুধু উপোস থাকার নাম নয়। বরং মাথা হতে পা পর্যন্ত সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংযম পালন করাই প্রকৃত রোযাদারের আলামত। এজন্য রজব মাস হতেই রোযাদারকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।

মুখের সংযম– রোযাদারের জবানে কোন গালাগালি, অশ্লীল কথা বা গান-বাজনা করা যাবেনা। করলে মুখের রোযা নষ্ট হবে।

চোখের সংযম– কোন প্রকার অশ্লীল দৃশ্য, পর্ণোগ্রাফি, অশ্লীল সিনেমা ইত্যাদি দেখা যাবে না। দেখলে চোখের রোযা নষ্ট হবে এবং মহান আল্লাহর নিকট এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।

মনের সংযম– মন-মানসিকতায় কোন ধরনের কু-চিন্তা, কু-ধারণা বা কু-পরিকল্পনা রমযানের আগেই ছেড়ে দিতে হবে এবং তাওবা করে পূত পবিত্র হয়ে রমযানে সকল প্রকার ইবাদাতের প্রস্তুতি নিতে হবে। এজন্যেই বলা হয়; রজব-শাবান হলো রমযানের পূর্ব প্রস্তুতির মাস এবং যাবতীয় ইবাদাত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাস।

আশহুরুল হুরুম– রজব, শাবান ও রমযান এ তিন মাসকে 'আশহুরুল হুরুম' বা অতি সম্মানিত মাস হিসেবে গণ্য করা হয়। এ-তিন মাসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাত রয়েছে যেগুলো মুমিনের জন্যে আল্লাহ পাকের দেয়া মহা নিয়ামাত।

১। লাইলাতুল মেরাজ ২। লাইলাতুল বারাআত ৩। লাইলাতুল ক্বদর।

এ-মহিমান্বিত রাতগুলোর ফজিলত ও মর্যাদার আলোচনা করা এ স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। যদিও এ ব্যাপারে ওলামাগণের মাঝে মত পার্থক্য রয়েছে। তবে এ-রাতগুলোয় কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার ও দোয়া-দুরুদের মাধ্যমে মহান আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করার বড় এক উছিলা রেখেছেন, এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়।

গুনাহর কাজ পরিত্যাগ করা

রজবের চাঁদ উদয় হওয়ার পরই বিগত জীবনের যাবতীয় গুনাহ হতে মহান আল্লাহর নিকট খাস দিলে তাওবা করে ক্ষমা চাওয়া উচিত। কেননা রাসূল (সা) বলেছেন– মহান আল্লাহ এসব রাতে সূর্যাস্তের পূর্বে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়ে তার বান্দাদের ডাকতে থাকেন; কে আছো গুনাহর ভারে অনুতপ্ত। আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। কে আছো, যার রিযিকের অভাব, এখন আমার নিকট চাও, আমি তোমাদের রিযিক বাড়িয়ে দেব। এভাবে সূর্য উদয় পর্যন্ত তিনি ডাকতে থাকেন। অতএব রজবের চাঁদ ওঠা থেকে শাবানের চাঁদের শেষ পর্যন্ত তাওবা ইস্তিগফারের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং এদিন হতেই সকল গুনাহর কাজ পরিত্যাগ করে রমযানের সিয়াম সাধনায় ব্রত হওয়াই পরম সৌভাগ্যের কাজ।

কালোবাজারী বা মজুদদারী

রজব ও শা'বান মাসে আমাদের বহু মুসলিম ব্যবসায়ীগণকে দেখা যায় যারা রমযানে বেশি মুনাফা লাভের জন্য খাদ্যদ্রব্য সহ বহু জরুরী নিত্য পণ্যসামগ্রী গুদামজাত করে মজুদদারীর মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। যে কারণে এ সময়ে পণ্যের দাম দ্বিগুণ বা তিনগুণ বেড়ে যায়। ফলে অনেক মধ্যবিত্ত রোযাদারগণকে নিদারুন কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন– 'কেহ যদি খাদ্য পণ্যদ্রব্য গোদামজাত করে অতি লাভের আশায় মজুদদারী করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে, আল্লাহ তাকে দূরারোগ্য ব্যাধি ও দারিদ্রতায় ফেলে শাস্তি দিবেন (ইবনে মাজাহ : ৭২৯)। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন– খাঁটি ব্যবসায়ী হালাল রিজিক প্রাপ্ত। আর সংকট সৃষ্টিকারী অভিশপ্ত (ইবনে মাজাহ ৫১৫)।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের অনেক মুসলমানদের মাঝেই পবিত্র রমযানকে কেন্দ্র করে মজুতদারীর প্রবণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দ্বীনের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ ও আল্লাহর ভয় যদি এদের মনে থাকতো, তবে শুধু মুনাফার জন্যে এমন একটি মহিমান্বিত মাসে কোন রোযাদারকে কষ্ট দিয়ে মুনাফাখুরী করতো না। অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, আমাদের দেশে কিছু হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভদ্রলোক রয়েছেন। যারা নিজের উৎপাদিত কলা, পেঁপে বা বিভিন্ন ফল-ফুল রেখে দেন এবং পুণ্যের আশায় এগুলো পূজারীদের নিকট অতি স্বল্পমূল্যে বিক্রি করেন। এখানে তাদের নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আমাদের মাঝে কিছু বকধার্মিক ব্যবসায়ী রয়েছেন যারা রমযানের প্রস্তুতিতো দূরের কথা, কিভাবে

মজুতদারীর মাধ্যমে বেশি মুনাফা পাওয়া যায় সে চিন্তায়ই তারা ব্যস্ত থাকে। এই হলো আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের অবস্থা!

ইফতার আয়োজন

ইফতার একটি ইবাদাত। এর পবিত্রতা এবং এর ভাবগাম্ভীর্যতা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। একটি ফরয হুকুম পালন করতে পেরে রোযাদারের আত্মা আনন্দিত হয়ে উঠে। তার মানে এই নয় যে, আনন্দে বিভোর হয়ে রকমারি ইফতারির মহা আয়োজন করে এক বিশাল অপচয়ের অনুষ্ঠান করা। যেগুলো বর্তমান সমাজে চলে আসছে। সমাজে এমন অভাবী মানুষও রয়েছেন যারা অনাহারে অর্ধাহারে রোযা রাখেন এবং সামান্য মুড়ি দিয়ে ইফতার করেন। এখানে ন্যায়ের দাবি হলো, হাজার মানুষকে লক্ষটাকা খরচ করে রাজসিক ইফতারি করানোর চেয়ে সাধারণ ইফতারির ব্যবস্থা করে বাকি অর্থ অনাহারী রোযাদারকে দান করা।

ভেজাল যুক্ত ইফতার সামগ্রী

রোযাদার ইফতারের নামে কি খাচ্ছে? রংবেরঙের লোভনীয় বহু ইফতারিতে বাজার সয়লাব। এগুলোতে কি কি রং বা ক্যামিক্যাল মিশ্রিত হচ্ছে অথবা এগুলো কতদিনের ফ্রিজিং বা কি ধরনের তেল দিয়ে বারবার ভাজা হচ্ছে? এ প্রশ্নগুলো কিন্তু থেকেই যায়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষেশজ্ঞগণের মাধ্যমে বাজারগুলো মনিটরিং করার ব্যাপারে এখনি প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন বলে জনগণ মনে করেন। তাই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দফতরের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পাশাপাশি ব্যবসায়ীগণকেও খাবারে ভেজাল মেশানো থেকে বিরত থাকা উচিত। যেহেতু খাবারগুলো রোযাদারগণই খেয়ে থাকেন। তাই কোন ব্যবসায়ির দ্বারা যেন পরোক্ষভাবে কোন রোযাদারের শারীরিক ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরী। যেহেতু রজব ও শাবান এ দু'মাস রমযানের প্রস্তুতির মাস। তাই এ দু'মাসে সকল পাপ হতে খাঁটি দিলে মহান আল্লাহর নিকট তাওবা করে রমযান মাসের সকল ইবাদাতের প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফিক আল্লাহ পাক সকলকে দান করুন। আমীন।♦

ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ: বিবর্তনের গভীরতম রহস্য

কাজী আখতারউদ্দিন

শত শত বছর ধরে ভাষাবিজ্ঞানী এবং গবেষকগণ ভাষা কীভাবে মানুষের মুখে এসেছে, তা নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক করেও এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট কোন উত্তর খুঁজে পাননি। ভাষার উৎপত্তি, মানব বির্বতনের সাথে এর সম্পর্ক এবং এর গুরুত্ব নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। তবে সরাসরি কোন প্রমাণ না থাকায় এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করাও বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যার পরিণতিতে ভাষার উৎস নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহী গবেষকগণকে অন্য ধরনের প্রমাণ, যেমন জীবাশ্ম রেকর্ড, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, সমকালিন ভাষার বিভক্তিসহ আরো অনেক ধরনের প্রমাণ থেকে অনুমান নিয়ে গবেষণা করতে হয়েছে। তবে প্রায়োগিক প্রমাণের অভাবে অনেকেই এই বিষয়টিকে গভীর গবেষণা করার জন্য অনুপযুক্ত মনে করেছেন। অবশেষে ১৮৮৬ সালে (Linguistic Society of Paris) লিঙগোইস্টিক সোসাইটি অব প্যারিস এই বিষয়টি নিয়ে তর্কবিতর্ক নিষিদ্ধ

ঘোষণা করলো, যা বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন। তারা মনে করতেন এই তর্কবিতর্ক বিজ্ঞানসম্মত ছিল না।

ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে ইসলামি মত

মানবজাতির আদিপিতা আদম (আ)-কে বিভিন্ন প্রাণীর নাম বলতে বলা হয়েছিল, যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এই বিষয়টি পবিত্র কুরআন (২: ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩) এবং বাইবেলের (জেনেসিস ২:১৯-২০) বর্ণিত রয়েছে। এখানে এই ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের বিবর্তনের সাথেই মানুষের মুখে ভাষা এসেছে। আল্লাহ প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর জাতির কাছে, তাঁদের ভাষা ব্যবহার করে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর কথায় এভাবে বলেছেন:

'আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষি করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা ইব্রাহিম, ৪)। ভাষার বিষয়টি আল্লাহ কুরআনেই মীমাংসা করে দিয়েছেন। আর তাঁর ক্ষমতার একটি প্রমাণ হচ্ছে যে, বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন বর্ণের মানুষ।

'আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন জ্ঞানবানদের জন্য।' (সূরা রুম, ২২)

তিনি বলিলেন: হে আদম! তাহাদেরকে এই সকলের নাম বলিয়া দাও।' সে তাহাদেরকে এই সকলের নাম বলিয়া দিলে তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাহাও জানি?'' (সুরা বাকারা, ৩৩)

পবিত্র কুরআনের উপরিল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ মানুষের কথা বলার ক্ষমতার উপর জোর দিয়ে ফেরেশতাদেরকে মানুষের বিশেষ বা সুউচ্চ অবস্থান দেখাচ্ছেন।

ভাষা ও মানুষ

আল্লাহ কী বলছেন আদম ও হাওয়া তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং ওরাও একই ভাষায় নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করতে পারছিলেন। 'শুরুতে কথা/শব্দ ছিল।' বাইবেলের সুসমাচারে (জন ১:১) উল্লেখ করা আছে। তবে কথা বা শব্দ কী? আর কোথায় এটা বলা হয়েছিল? মানুষ কীভাবে কথা বলতে

শিখলো? প্রকৃতপক্ষে মানব বিজ্ঞানে ভাষার উদ্ভবের প্রশ্নটি এখনও অন্যতম প্রধান একটি রহস্য হয়ে রয়েছে।

উপরের আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু হচ্ছে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা। ফেরেশতগণ মানুষ সৃষ্টির মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাদের ধারণা এই সৃষ্টি পৃথিবীতে হানাহানি এবং রক্তপাতের কারণ হবে এবং তারা আল্লাহর কাছে মানুষ সৃষ্টির যৌক্তিকতা জানতে চান। তখন আল্লাহ বলেন যে, তিনি যা জানেন, ওরা তা জানে না এবং তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেন তার সবকিছুতে গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞান রয়েছে।

এবার মানুষের মুখের ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা। একটি সত্ত্বা হিসেবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার উপর। ২০ শতকে ভাষার দর্শনের উদ্ভব ঘটে এবং এবিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা ছাড়া আমরা এখন যেরকম মানুষ আছি, সেভাবে আমাদের অস্তিত্ব থাকতো না। ১৯২০ সালে বিখ্যাত দার্শনিক বার্টান্ড রাসেল স্বীকার করেন যে, মানুষের ভাষা এমন একটি উপায়, যা সে বিশেষ মনোযোগ না দিয়েই ব্যবহার করতে পারে। আবার লেখক, দার্শনিক এবং ভাষ্যকার ব্রায়ান ম্যাগি বলেন যে, কেবল দার্শনিক নয়, এই কথাটি ঔপন্যাসিক, কবি এবং নাট্যকারদের বেলায়ও সত্যি। বিশ শতকে ভাষা ব্যবহারের আত্মসচেতনতার ক্রমবিকাশ ঘটে এবং তা সেই যুগের দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠে। তবে মোটামুটি এতটুকু বলা যায় যে, ভাষাই হচ্ছে মূল বৈশিষ্ট্য, যা আমাদেরকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। অতএব একটি ভাষা শেখা থেকে আমরা নিজেদেরকে গড়ে তুলি। তবে সমগ্র মানবজাতি এবং একজন ব্যক্তির জন্যও ভাষার গুরুত্ব যে এমন বিশাল, তা তেমনভাবে ধারণা করা হয়নি। ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কুরআনে এই গুরুত্বের কথা জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা

১৯৯০ থেকে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী, প্রত্নতত্ত্ববিদ, মনোবিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদ বিজ্ঞানের অন্যতম কঠিন এই সমস্যাটি সমাধানের প্রচেষ্টা করে আসছেন। আধুনিক মতবাদের প্রবক্তারা দুটি ধারণার কথা বলেন। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity) অথবা বিচ্ছিন্নতা (Discontinuity)। ভাষা বিকাশ প্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা মতবাদে বলা হয়, ভাষা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। মানুষের সর্বপ্রথম পূর্বপুরুষ থেকে শুরু হয়ে ক্রমাগত বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমবিকাশ ঘটতে ঘটতে মানুষের মুখের কথা এখন যা আছে, সে পর্যায়ে পৌঁছেছে। অন্যদিকে

বিচ্ছিন্নতা বা ধারাবাহিকতাহীন (Discontinuity) মতবাদে বলা হয়েছে যে, মানুষের ভাষার সাথে সামান্যতমও তুলনা করা যায় তেমন কিছু নেই, তাই এটা সম্ভবত আকস্মিকভাবে কোন একসময় মানব ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছে। হয়তো একজন মানুষের মধ্যে জিনগত কোন পরিবর্তনের ফলে এটা হয়েছে, তারপর তার অধ্বস্তন পুরুষদের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে পরিশেষে এটা একটি প্রধান সক্ষমতা হয়ে দঁড়িয়েছে।

একটি শিশু জন্ম হওয়ার পর কীভাবে কথা বলতে শুরু করে?

জার্মান দার্শনিক গটলব ফ্রেজ এবং ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল যখন গণিতের দর্শন নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তখনই ভাষার দর্শনের বিষয়টি বেরিয়ে আসে। ভাষার বিষয়ে নোয়াম চমস্কির বিবৃতিটি ৫০ দশকে যথেষ্ট গুরুত্ব এনে দেয়। ভাষার মতো জটিল এবং কঠিন একটি বিষয় সামলানোর ব্যাপারটি কেবল এই ধারণার কথা বলে ব্যাখ্যা করা যায় না যে, একটি শিশু জন্মের পর কোন পূর্ব প্রশিক্ষণ ছাড়াই কথা বলতে শেখে। আগেকার সময়ে মনে করা হতো যে, ভাষা হচ্ছে একের পর এক কতগুলো অভ্যাস, দক্ষতা এবং প্রবণতার পরম্পরা, যা অনুশীলন, পুনরাবৃত্তি, সর্বজনীনকরণ এবং সাহচর্যের মাধ্যমে আয়ত্তে আসে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ মানুষই প্রথাগত কোন শিক্ষালাভ করে না। অন্যকথায় বলা যায়, সাধারণত মা-বাবারা তাদের সন্তানকে ভাষা সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত কোন নীতিনিয়ম শিক্ষা দেন না। এটা আরও স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, যদি কেউ বিবেচনা করেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত শিক্ষালাভ করে না। তারপরও এই সত্যটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, শিশু অতি অল্পবয়সে কথা বলতে শেখে।

নোয়াম চমস্কির সাথে ঐকমত্য হয়ে বলা যায় যে, একটি শিশু যখনই তার পরিবেশ বা পারিপার্শিকতার সাথে যোগাযোগ করতে চায়, তখনই তাকে পরিপূর্ণভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে যে, কীভাবে কথা বলতে হয়। আমাদের চোখ যেভাবে পৃথিবীর চারপাশের সবকিছু স্বাধীন এবং বিস্তারিতভাবে দেখতে প্রস্তুত হয়, সেইভাবে আমাদের মনও এর চারপাশে কী বলা হচ্ছে তা বোঝার জন্য সহজাত ক্ষমতা ব্যবহার করতে তৈরি হয়। চোখ যখনই চারপাশে তাকাতে শুরু করে, তখন কান এবং মনও কারও কথা শুনতে উদগ্রিব হয় এমন একটি পরিবেশে, যেখানে সে তা অর্জন বা গ্রহণ করতে পারে। জার্মান বহুশাস্ত্রজ্ঞ এবং দার্শনিক আলেকজান্ডার ভন হামবল্ট বলেছেন, শৈশবেই আমরা সসীম পদ্ধতি অসীম উপায়ে ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন করি।

নিচের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে চমস্কি ব্যাখ্যা করেছেন ভাষা শিখতে মন কীভাবে তৈরি হয়ঃ 'মনের প্রাথমিক অবস্থাকে আমরা একটি কাজ (function) হিসেবে ধরে নিতে পারি। যখন পরীক্ষানিরীক্ষা করার জন্য এতে ইনপুট দেওয়া হয়, তখন আমরা ভাষার ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত একটি ফলাফল পাই। এটা ঠিক এরকম, যখন আমরা ৯ সংখ্যার বর্গমূল বের করার জন্য এটাকে একটি ফাংশনের মধ্যে দেই, তখন আমরা ৩ সংখ্যাটি পাই।' চমস্কির বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, একটি ক্যালকুলেটার যেমন গণনা বা হিসাব করার জন্য তৈরি হয়, তেমনি আমাদের মনও কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়। যখন আমাদের মন একটি ভাষার দেখা পায়, তখন মন তা শিখতে শুরু করে।

১৮৬১ সালে ভাষা বিজ্ঞানী ম্যাক্স মুলার কথ্য ও লিখিত ভাষার উৎস সম্পর্কে কয়েকটি তত্ত্বের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। কল্পিত এই থিওরীগুলোর নামও অদ্ভুত ধরনের।

* **বো-ঔ** বা কোকিল তত্ত্বে বলা হয় যে, গান গাওয়া পাখির মতো মানুষও চারপাশের বিভিন্ন শব্দ এবং প্রাণীর ডাক নকল করা শুরু করে। আর এই আওয়াজগুলো থেকেই শব্দের উদ্ভব হয়।

* **ডিং-ডং** তত্ত্বে মুলার বলেছেন যে, সকল বস্তুর একধরনের স্বাভাবিক কম্পমান অনুরণন আছে। এটিই মানুষের প্রথমদিকের কথায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। শব্দ সংকেতের উপর ভিত্তি করে গঠিত। ছোট অথবা ধারালো বস্তুর নাম উচ্চ স্বরধ্বনি দিয়ে বলা হয়, সে তুলনায় বড় বা গোলাকার বস্তুর নামের শেষে ও স্বরবর্ণ থাকে।

* **পুহ-পুহ** তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, অবাক কিংবা খুশি হলে বা যন্ত্রণার কাতরানি থেকে প্রথম যে শব্দ মুখ থেকে বের হয়, তাই প্রথম ভাষার শব্দ।

* **ইয়ো-হে-হো** তত্ত্ব- কায়িক পরিশ্রমে পেশি শক্তি ব্যবহার করার সময় যে, শব্দ হয়, তা থেকে ইয়ে-হে-হো তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। তবে বর্তমান যুগের ভাষাবিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদরা এই আজব তত্ত্বগুলো প্রায় বাতিল করেছেন।

মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী যে কথা বলতে পারে না, এটি একটি অলৌকিক সত্য। আমরা কথা বলতে পারি অথচ মানুষের সবচেয়ে কাছের প্রাণী বানর পারে না, কেননা তাদের স্বরযন্ত্র মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যে কারণে এরা মানুষের মতো শব্দ উচ্চারণ করতে অক্ষম। তবে দৈহিক সক্ষমতা ছাড়াও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিও মানুষের কথা বলার দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হয়েছে।

বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি বিচ্ছিন্নতা (discontinuity theory,) তত্ত্বের একজন প্রস্তাবক। তিনিই এই রহস্য অর্থাৎ ভাষা কীভাবে এবং কোথা

থেকে এল, এর সমাধানের কাছাকাছি এসেছেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, প্রায় ১০০,০০০ বছর আগে আমাদের কোন এক পূর্বপুরুষের সম্ভবত জিনগত একটি পরিবর্তন ঘটেছিল, যার ফলে সেই পূর্বপুরুষ কথা বুঝতে এবং বলতে সক্ষম হয়েছিল। এই ক্ষমতা তার সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই সক্ষমতার উপযোগীতার কারণে ডারউইনের বিবর্তনবাদে বলা হয়েছে যে, এটা সমগ্র মানবজাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০০৯ সালে ন্যাচার পত্রিকায় প্রকাশিত ক্যালিফোর্নিয়া/এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণার নিবন্ধে এই তত্ত্ব সমর্থিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ভাষা এবং কথা বলার বিকাশ ঘটাতে অপরিহার্য FOXP2 জিনটি, মানুষ অথবা শিম্পাঞ্জির মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে ভিন্নরকম হয়। এতে একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, এই জিনটির পরিবর্তনের কারণে ভাষায় আলাদাকরণ/ভাঙন হয় এবং আমরা কথা বলতে পারলেও অন্যান্য প্রাণী পারে না। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড জেফেন স্কুল অব মেডিসিনের ডক্টর ড্যানিয়েল জেসউইন্ড বলেছেন: ‘ইতিপূর্বেকার গবেষণায় জনা গেছে যে, আধুনিক মানুষের মধ্যে যখন ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল, ঠিক প্রায় সেই সময়েই মানবদেহের (FOXP2) ফক্সপি২ জিনের অ্যামিনো এসিড যৌগে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।’ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, জিনটির কাজ এবং চেহারা মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির মধ্যে ভিন্ন রকম ছিল। আর এই প্রভেদ বা ভিন্নতার অর্থ হচ্ছে যে, মানুষের মস্তিষ্ক ভাষার জন্য সবল সক্রিয় হয়েছিল, তবে শিম্পাঞ্জির হয়নি। তাহলে বহুপূর্বে এই একটি জিনের পরিবর্তনের কারণে কী পৃথিবীর অন্যসব প্রাণী থেকে আমরা আলাদা হয়েছি?

আরেকটি তত্ত্ব তুলে ধরেছেন নৃতত্ত্ববিদ রবিন ডানবার। তিনি বলেন, যখন মানব সমাজ বড় হতে শুরু করলো, তখন মানুষ তার সমশ্রেণীর লোকদেরকে তার পাশে রাখার জন্য আরো দক্ষ কোন এক ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন অনুভব করলো। ফলে একধরনের কণ্ঠজাত প্রস্তুতির বিকাশ ঘটলো আর এতে মনে হয় আগেকার দিনের এধরনের আলাপ হয়তো, এখন আমরা যে খোশগল্প করি, সেরকম কিছু ছিল।

তবে ভাষার বিবর্তন কীভাবে ঘটলো, চমস্কির মতবাদই সেই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর নয়। আরো অনেক বিশেষজ্ঞ অবিচ্ছিন্নতা মতবাদ অনুসরণ করে বলেছেন যে, আদিম মানুষের মধ্যে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে ভাষা বিকাশের আগেকার শব্দসমূহ থেকে। এই বিষয়ে আরো অনেক ধারণার উদ্ভব হয়েছে, যার সবগুলো এখানে তুলে ধরলে এর কলেবর অনেক বেড়ে যাবে।

ভাষার বিবর্তন শুরুর সময়সীমা সম্পর্কে অন্তত এটুকু বলা যায় যে, *হোমো স্যাপিয়ানের* ভাষার বিকাশ ঘটেছে আনুমানিক ২০০,০০০ বছর আগে। বার্কলে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাষাবিজ্ঞানী, জোহানা নিকলস ১৯৯৮ সালে যুক্তি দেখান যে, আনুমানিক ১০০,০০ বছর আগে আমাদের প্রজাতীর মধ্যে মুখের বা বাচনিক ভাষা ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এছাড়া কিউ.ডি এটকিনসনের গবেষণা আরো থেকে জানা যায় যে, ভাষার প্রথম বিকশিত হয়েছিল আনুমানিক ৫০,০০০- ১৫০,০০০ বছর আগে, সেই সময়ে আধুনিক *হোমো স্যাপিয়ানের* বিকাশ ঘটেছিল। তবে এতকিছুর পরও মানুষ কবে, কোথায় কীভাবে ভাষা শিখলো, তার সঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ (সূরা আর-রাহমান, ৩)। তিনি তাকে শিখিয়েছেন কথা বলতে (সূরা আর রাহমান, ৪)

আদম (আ) এবং তাঁর বংশধরদের জন্য ভাষা আল্লাহর একটি সহজাত দান। আমরা যদি আমাদের শৈশবের দিনগুলোতে ফিরে যাই/স্মরণ করি এবং জানার চেষ্টা করি কী উপায়ে আমরা কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করেছি এবং একটি শব্দভান্ডার গড়ে তুলেছি, তাহলে কী আমরা সেই পদ্ধতির কথা জানতে পারবো, বিশেষত এটা যখন আমাদের সবচেয়ে অক্ষম বছরগুলোতে ঘটেছিল। তাহলে এটা কী করে হয় যে, নিজের তরফ থেকে কোন ধরনের সচেতন অংশগ্রহণ ছাড়াই আমরা কথা বলতে শিখতে পেরেছি?

ভাষা না থাকলে কী হতো?

ভাষার মূল্যায়ন করতে হলে, আমাদেরকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে, 'যদি কোন ভাষা না থাকতো, তাহলে কী হতো?' যদি ভাষা বলতে তেমন কিছু না থাকতো, তাহলে কোন রাষ্ট্র, শহর, গ্রাম এমনকি পরিবারও হতো না। সামাজিক প্রতিষ্ঠানহীন এরকম একটি পরিবেশে, কখনও কোন উৎপাদন হতো না। পরিণতিতে কোন পোশাক, গাড়ি, কাচের সামগ্রী, পেনসিল, নোটবুক ইত্যাদি কিছুই থাকতো না।

ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা কেবল ভাষাগত প্রকাশ থেকেই করা সম্ভব। এমনকি ভাষার গুরুত্ব নিয়ে রচিত এই রচনাটিও ভাষা ব্যবহারের ফল। যদি এই সত্যটি ধরে নেওয়া যায় যে, ভাষার গুরুত্ব ভাষার প্রকাশভঙ্গিতেই খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে মানুষ কী একটি ভাষা সৃষ্টি করতে পারতো, যখন এর কোন ধারণাই ছিল না? ভাষা একটি অভূতপূর্ব সামাজিক ঘটনা আর যেখানে ভাষা নেই, সেখানে কোন সমাজ নেই।

ভাষার উন্নতি বা বিকাশ সাধন অবশ্যই সম্ভব। তবে এটা তখনই সম্ভব, যখন কেউ একটি ভাষার একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত জানেন। একটি চারাগাছ যেমন বড় হয়ে উঠে, তেমনি একটি ভাষারও তেমনি ক্রমবিকাশ হতে পারে। একটি ভাষার অভাব মানে বীজের অভাব, যার পরিণতিতে সব্জির ফলন হবে না। কিছুক্ষণের জন্য কেবল বিবেচনা করুন যে, কোন একটি বিশেষ ধারণার জন্য একটি শব্দ পাওয়া গেছে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, মানুষ ভাষা জানতো না, তাহলে সেই শব্দটি হারিয়ে যেত। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ভাষা ছাড়া ভাষার গুরুত্বের ধারণা করা যায় না, তাহলে সামাজিকতার জন্য মাঝে মধ্যে আবোলতাবোল শব্দোচ্চারণ বা অবোধ্য শব্দ মুখ থেকে বের করলে, তা দিয়ে যোগাযোগের একটি সর্বজনীন প্রাঞ্জল উপায় তৈরি করা যায় না।

ভাষা হচ্ছে একটি উপায়, যা সমাজকে ঐকমত্য হতে অহ্বান করে। সামাজিক সচেতনাহীন একটি পরিবেশে, ঐকমত্যের উপর ভিত্তি করে একটি ভাষা আবিষ্কারের কথা কল্পনাই করা যায় না।

মানুষ যদি জীবনের শুরুতেই কথা বলা থেকে বঞ্চিত হতো, তাহলে ত বেঁচে থাকাই মুশকিল হতো। আদি মানবকে যে কথা বলা শেখানো হয়েছিল, কুরআনের এই বিবরণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি মানসিক সক্ষমতা নিয়ে মানুষের জন্ম হয়, তার কান যা শুনে তা গ্রহণ করতে, মুখ ও জিহ্বা তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে প্রস্তুত। হঠাৎ যুগপৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনাকে নিখুঁত এবং জটিলভাবে সৃষ্ট আমাদের কান, মুখ এবং জিহ্বার কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া যায় না। এসবের সাথে অবশ্যই আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে দান হিসেবে পাওয়া কথা বলার ক্ষমতাকে যুক্ত করতে হবে। 'অতঃপর আদম তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হইল.. . ' (সূরা বাকারা, ৩৭)

সূত্রঃ আব্দুল গফুর, দি অরিজিনস অব হিউম্যান ল্যাঙোয়েজ, ইসলামিক পার্সপেক্টিভ এন্ড সায়েন্স। 'মিরাকলস অব কুরআন,' quranmircales.com.; *Hauser, M. D.; Yang, C.; Berwick, R. C.; Tattersall, I.; Ryan, M. J.; Watumull, J.; Chomsky, N.; Lewontin, R. C. (2014).* "The mystery of language evolution" ♦

আসমানী ধর্মগ্রন্থসমূহের ভাষা ও মাতৃভাষা

মুফতী জুনাইদ আহমাদ

ভাষা হচ্ছে ভাব প্রকাশের বাহন। একটি মানব শিশু পৃথিবীতে জন্মলাভের পর সে থাকে সবচেয়ে অসহায়, সে নিজে নিজের কাজ করা দূরে থাক নিজেকে ঠাণ্ডা ও গরম এমনকি মশামাছি থেকে বাঁচনোর ক্ষমতাও রাখে না। কায়িক এ শক্তিমত্তার চেয়ে আরো বেশি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাব তার মধ্যে বিরাজ করে আর তা হলো তার ভাষা–তার মুখের বুলি। প্রথমে হয়ত বডি ল্যাংগুয়েজ বা অঙ্গভঙ্গি কিংবা কান্নাকাটির মাধ্যমে খাবার চাওয়ার মত অতি প্রয়োজনীয় কাজটি করতে সক্ষম হয়, কিন্তু আক্ষরিক ভাষা বা মুখের বুলির অভাব কিন্তু থেকেই যায়। অবশেষে মায়ের মুখের ভাবোক্তি আয়ত্ব করার মহড়া সমাপ্ত করে এক পর্যায়ে মা-বাবা, দাদার ন্যায় একটি দুটি করে বুলি আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়; এটাই ভাষা এটাই মাতৃভাষা। ভাষা ও মাতৃভাষাকে আমি আলাদা করে দেখতে

চাই না। কারণ প্রতিটি ভাষাই কারো না কারো মাতৃভাষা; কারো না কারো নাড়ী ছেড়া ধন ভাব প্রকাশের অমূল্য বাহন। এটি আল্লাহ তাআলার অপার নেয়ামত; আবেগ অনুভূতি ও ভাব প্রকাশের মাধ্যম। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন "তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে (মাতৃ) ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন" (সূরা রাহমান, আয়াত নং ৩-৪)।

পৃথিবীতে যেমন আছে বহু দেশ ও জাতি বহু গোত্র ও বর্ণ; কারো চেহারার সাথে কারো চেহারার মিল নেই, তদ্রুপ ভাষারও রয়েছে ভিন্নতা। এটা মহান আল্লাহর মহা কুদরত ও মহিমার বহিঃপ্রকাশ। আল কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে : "আর তাঁরই কুদরতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি এবং পৃথক পৃথক হওয়া তোমাদের ভাষা ও বর্ণের। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানবানদের জন্য রয়েছে নিদর্শন" (সূরা রূম, আয়াত নং-২২)।

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি গুণের পাশাপাশি ভাষা গুনের উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির পরই মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন যে বিষয়টি তা হলো ভাষা। ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব সমধিক, আল্লাহ তাআলা কোন নবী রাসূলকেই তাদের স্বজাতি ছাড়া প্রেরণ করেননি। তারা প্রত্যেকেই স্বজাতির ভাষায় কথা বলতেন। নবী রাসূলগণ মাতৃভাষার মাধ্যমে তাদের উম্মতদের কাছে হেদায়েত বাণী পৌঁছে দিতেন। এ কাজটি মাতৃভাষা ছাড়া অসম্ভবও বটে।

আল্লাহ তাআলা যত নবী রাসূলের উপর আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন তার সবই নাযিল হয়েছে ঐসব জাতির মাতৃভাষায় যে ভাষা তাদের মায়েদের মুখ থেকে রপ্ত করেছে, যে ভাষায় তারা পরস্পর কথা বলতো, যাতে তারা সহজে হৃদয়ঙ্গমপূর্বক আত্মস্থ করতে পারে ও হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। বিদেশী কিংবা কোন ভিন্ন ভাষায় কিতাব নাযিল হলে জাতির লোকেরা এর পাঠোদ্বার করতেই হিমশিম খেতো। এ থেকে শিক্ষা নেয়া তাদের জন্য হতো অত্যন্ত দুরূহ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "আমি পৃথিবীতে এমন কোন নবী রাসূল প্রেরণ করিনি যারা তাদের জাতীয় ভাষা জানতো না যাতে করে তারা তাদের জাতিকে নিজ ভাষায় বোঝাতে পারে"। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং ৪)

আল্লাহ তাআলা ছোট বড় যে ১০৪ খানা আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার প্রত্যেকটি রচিত ছিল নিজ নিজ রাসূলের স্বজাতির নিজস্ব ভাষায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে প্রধান চারটি আসমানী কিতাবের মধ্যে তাওরাত হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি হিব্রু ভাষায়, হযরত ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল সুরিয়ানী ভাষায় হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ যাবূর ইউনানী ভাষায় অবতীর্ণ হয়। এ ভাষাগুলোর প্রতিটিই স্বজাতির ভাষা।

প্রধান ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হয় তা হলো আরবী ভাষায় রচিত। এ আরবী ভাষায় আল কুরআন নাযিল হওয়ার প্রধান ও অন্যতম কারণ হলো যার উপর অবতীর্ণ হচ্ছে সে রাসূলের মাতৃভাষা আরবী এবং এ গ্রন্থ দ্বারা প্রথম যাদেরকে বুঝানো হবে তাদের ভাষাও আরবী। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি একে

নাযিল করেছি আরবী ভাষায় যেন তোমরা বুঝতে পার" (সূরা ইউসুফ, আয়াত নং ২)। এই একই অন্তর্নিহিত কারণে সকল আসমানী কিতাব সে এলাকার অধিবাসীদের মাতৃভাষায় নাযিল করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে আরবী ভাষাভাষী ছিলেন। হাদীসে এসেছে, "তোমরা তিন কারণে আরবীকে ভালোবাস কেননা আমি নিজে আরবী ভাষাভাষি, কুরআনের ভাষা আরবী এবং জান্নাতবাসীর ভাষা আরবী।" তথাপি রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পার্শ্ববর্তী ভিন্ন ভাষাভাষি এলাকায় দীনের দাওয়াত প্রেরণ করতে চাইলেন তখন তাকে সে এলাকার ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে তবে তথায় পাঠিয়ে ছিলেন। ৬১৫ ঈসায়ী সালে হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন দীনী দাওয়াতের একটি প্রতিনিধি দল হযরত জাফর ইবন আবি তালিবের নেতৃত্বে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করতে চাইলেন; দেখলেন সেখানকার বাদশাহ নাজ্জাশী, তাদের ধর্ম খৃষ্ট

ধর্ম এবং তাদের ভাষা হাবসী। রাসূলুল্লাহ (সা) তার প্রতিনিধিকে হাবসী ভাষা শিক্ষার নির্দেশ দেন। তারা বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট হাবসী ভাষায় ইসলামের বাণী উপস্থাপন করলে তিনি তাদের ভাষার পারদর্শিতা দেখে অভিভূত হয়ে যান। তাই দেখা যায় ইসলাম মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনে যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে।

একজন মানুষ তার হাসি তার কান্না, স্বপ্ন দেখা, আঁৎকে উঠা এক কথায় জীবনকে ঘিরে তার সকল স্বপ্ন সাধ তার নিজস্ব মাতৃভাষায়। তাই ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব এতখানি। আল্লাহ তাআলা স্বজাতির মাতৃভাষা আরবীতে আল কুরআন নাযিল করেছেন, তা আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতমালাতেও বিবৃত হয়েছে :

মহান আল্লাহ বলেন, "এভাবে আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় যাতে আপনি সতর্ক করেন সকল শহরের মূল মক্কা ও তার চতুর্দিকের জনগণকে এবং আপনি সতর্ক করবেন কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই। সে দিন একদল জান্নাতে যাবে একদল জাহান্নামে"। (সূরা শুরা, আয়াত নং ৭)

ইরশাদ হচ্ছে, "এক কিতাব বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ আরবী ভাষায়। এটা বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য" (সূরা হামীম আস সাজদাহ, আয়াত নং ৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন, এটা এমন কুরআন যা কোনরূপ বক্রতামুক্ত (অবতীর্ণ করা হয়েছে এজন্য) যাতে তারা সাবধানতা অবলম্বন করে" (সূরা যুমার, আয়াত নং ২৮)

'মাতৃভাষা মানুষের সহজাত প্রিয় বস্তু' এটি প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও ধর্মীয় সামাজিক কারণেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃভাষার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা রেখে সকল ভাষার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা আমাদের নৈতিক, ঈমানী ও সামাজিক দায়িত্ব। কারণ সেটিও কারো না কারো মাতৃভাষা, কারো না কারো মায়ের প্রিয় বুলি, কারো না কারো নাড়ি ছেঁড়া ধন–প্রাণের ভাষা।♦

আজন্ম মাতৃভাষাপ্রেমী বঙ্গবন্ধু ও ভাষা-আন্দোলনের ইতিবৃত্ত

মিলন সব্যসাচী

বিপ্লবী চেতনার অগ্নিপুরুষ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ বাঙালি জাতিকে যিনি দিয়েছেন- ভাষারাষ্ট্র ও জাতিরাষ্ট্রের শীর্ষবিন্দু স্পর্শী সম্মান। বিদ্রোহের অর্থ অস্বীকৃতি প্রদান আর বিপ্লবের অর্থ বোধহয় অঙ্গীকার। অঙ্গীকারের জঠর থেকে নবযুগের জন্ম। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালির নয় প্রতিটি বাংলাভাষীর প্রাণের প্রিয়মানুষ। ২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোষহীন সংগ্রামী নেতা মুজিবের দূরদৃষ্টি শক্তি ছিল অসাধারণ। নন্দিত-নেতৃত্বে, সাহসী-সংগ্রামে, মেধা-মননে, শাসনে-

শোষণে, বঞ্চিত-ব্যথায়, মিছিলে-মিটিংয়ে, মহামুক্তির ভাষণে ও বারবার কারাবরণে তিনিই তাঁর তুলনা। তিনি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুবার কারাবরণ করেছেন। তাঁর সাহসী পদক্ষেপের সফল কীর্তি, সুমধুর সাম্যগীতি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষমূখি গৌরবগাঁথা ও মাহন স্বাধীনতার সমুজ্জ্বল ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের প্রেরণাশক্তি। সারা বিশ্বের সব বাঙালির একান্ত আত্মজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সংগ্রামী দৃঢ়চেতা মহান নেতা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের রূপকার। আন্তর্জাতিক স্তরে বাঙালির জাতিগত, ভাষাগত, বাংলাভাষা এবং বাংলাদেশকে উন্নীত করে আত্মমর্যাদার সাথে স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ডের স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। যে পাঁচজন বঙ্গসন্তান বাঙালির গর্ব ও অহংকারের ঠিকানা সেই মন্ডলে শেখ মুজিব সমমর্যাদার সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। তাঁর অসীম আকাশের মত বুকে বিস্তৃত স্বপ্নের সবটুকু জুড়ে ছিল বাঙালি জাতিকে স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বায়ত্বশাসন ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস এবং প্রতিজ্ঞা। সমষ্টিগত স্বপ্ন বাস্তবায়নে সর্বাগ্রে তিনি মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং সম্মান অনুভব করেছিলেন। এমন মর্মস্পর্শী অনুভবের অতলান্তিক গভীর থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই কি, কিন্তু তার চেয়ে বড় কাজ দেশের চিত্তকে সরল, সফল ও সমুজ্জ্বল করা।' সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তার তেল যোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নিভানো চলে না। মানুষের মনের গহীনে প্রবেশের জন্য যে আকুতি অনিবার্য হয়ে ওঠে সেই আকুলতার নির্ভরশীল বিনিময় তার হৃদয়স্পর্শী মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ এ প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম। ওই বছরেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের করাচিতে পাকিস্তানের শিক্ষা অধিবেশন আহ্বান করেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামের আদর্শে ঢেলে সাজানোর অপপ্রয়াসে অধিবেশ আহুত হয়। অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে এই মর্মে উল্লেখ ছিল যে, 'উর্দুই হবে পকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। একতরফা এই প্রস্তাবের পরিণামে বহুমাত্রিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। কারণ উর্দু পাকিস্তানের প্রথম ভাষা হিসাবে স্বীকৃত নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম সম্প্রদায়ও উর্দুকে প্রথম ভাষার স্থানে মেনে নিতে পারেনি। তখন বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের জন্য তমদ্দুদিন মসলিসের বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাদের

অকুণ্ঠ সমর্থন দিতে বহু বামপন্থী বুদ্ধিজীবীও পাশে দাঁড়ান। সরকারি সব কাগজপত্র, মুদ্রা, মানি অর্ডার ফর্ম ও ডাকটিকেটে ইংরেজি ও উর্দুভাষা মুদ্রনের কারণে জনগণের সমস্যা ও হয়রানি চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে বেড়ে যাচ্ছিল। অথচ বৃটিশ ভারতের শাসন আমলে জনসাধারণকে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়নি। এক সময় এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক জানানো হয় 'সরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তরপত্রে লেখার মাধ্যম হিসেবে উর্দু, হিন্দি, ফার্সি ও আরবি ভাষা ব্যবহার করতে হবে। বাংলা ব্যবহার করা চলবে না। বিবেচনাহীন এই ঘৃণ্য কর্মকান্ডে ছাত্রসমাজ আক্রশে ফেটে পড়ে। ফলে চারিদিকে উল্কার গতিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তখন বাঙালি ছাত্রসমাজের নেতৃত্বস্থায়ী নেতারা বুঝতে পারলেন বাঙালি ছাত্রদের চাকুরির প্রবেশদ্বার চিরতরে বন্ধ করতেই এ ঘৃণ্য উদ্দেশ্য গ্রহণের অপচেষ্টা চলছে। শেখ মুজিবুর রহমান তখনই 'ইস্ট পাকিস্তান মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ' নামে একটি ছাত্র সংগঠন গঠন করেন।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল মাত্র চৌদ্দ সদস্য বিশিষ্ট। সংগঠনের কমিটিতে শেখ মুজিবও ছিলেন। নাজিমুদ্দিন এই কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। নেতৃস্থানীয় অন্যতম 'সংগঠক ওলি আহাদ ও মোহাম্মদ তোহা সংগঠনের নামকরণ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়ার জন্য জোরালো দাবি তোলেন। ঘটনার প্রেক্ষাপটে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শেখ মুজিব তাদের বুঝালেন যে, সরকারের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য মুসলিম শব্দটি এখন প্রয়োজন।' যদিও পরবর্তী সময়ে ২১ শের ভাষা-আন্দোলনে 'স্টুডেন্টস লীগ' সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সংগঠনের মাত্র চারদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেই একটি ছাত্রপ্রতিনিধি দল পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়। সেখানে আলোচনায় ভাষা বিষয়ক সমস্যাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। দীর্ঘ আলোচনার এক পর্যায় মূখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রতিনিধি দলের কাছে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি তা বাস্তবায়ন করেনি। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরিষদ সদস্য জননেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাবে সংশোধনী এনে বলেন, 'বাংলাকেও সরকারি ভাষা হিসেবে গণ্য করতে হবে। ইংরেজী ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও সরকারি ভাষা করা হোক। ২৩ শে ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের উদ্বোধনী পর্যায়ে তিনি এই দৃষ্টি আকর্ষনীয় প্রস্তাব রাখেন। যে কারণে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী ও মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে। নন্দিতনেতা শেখ মুজিবুর রহমান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই প্রস্তাবের সমর্থনে সর্বস্তরে জনমত গঠনের কার্যকর ভূমিকা রাখেন। মুজিবের প্রচেষ্টায় ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। তখনই ভাষা-আন্দোলন কমিটি গঠন করা হয়। ভাষা আন্দোলন কমিটির আহ্বানে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পূর্ববাংলায় ধর্মঘট ডাকা হয়। ধর্মঘটের সংবাদ পেয়ে মুজিব গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় ছুটে আসেন। তিনি ১০ মার্চে এ্যাকশন কমিটির সভায় যোগদান করে ভাষা-আন্দোলনে সোচ্চার ভূমিকা নেওয়ায় জন্য সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানান। ১১ মার্চে এ্যাকশন কমিটির সভায় যোগ দিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য শেখ মুজিবসহ ২০০ শত জন সত্যাগ্রহীকে কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি করে। মুজিব কারাগারের অভ্যন্তরে বাঙালি অবাঙালিদের দ্বন্দ্ব অনুভব করেন। একজন অবাঙালি জেলা প্রশাসকের অস্বাভাবিক আচরণ ও দুর্বব্যহারে অতিষ্ঠ মুজিব প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। ঘটনাটি ক্রমাগত বিরূপ আকারে রূপান্তরিত হয়। কারাবন্দিদের অনেকেই মুজিবকে আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু মুজিবের দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতি তাদের নিখাদ আনুগত্য ও গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। হঠাৎ একজন বাঙালি কারারক্ষী এসেই ঘটনার স্রোত অন্যধারায় প্রবাহিত করেন। এ ঘটনা ঘটার পরবর্তী পর্যায় ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ফজুলল হক হলে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুজিব উপস্থিত হয়ে আসনে বসেই সভার কার্যক্রম পরিচালায় বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব করেননি। অথচ ওই সভাস্থলে মুজিবের সভাপতিত্ব করার বিষয় পূর্ব নির্ধারিত ছিল না। মুজিব তাৎক্ষণিকভাবে ভাবলেন এই সংকটময় মুহূর্তে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান বাংলাভাষী মানুষের ঐক্য রক্ষার মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভাষা আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে তুলতে হবে। নইলে সিংহভাগ মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর আন্দোলন বিফল হবে। সভাপতি যদি সভা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যাপক বিপত্তি ঘটবে। অনাগত দিনের আন্দোলন থমকে যাবে। দূরদর্শী মুজিব ওই সভায় বিস্তৃত আলোচনা বিরতি দিয়ে রাষ্ট্রের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পূর্ব বাংলার ভবিষ্যতের পরিণতি ও রাষ্ট্রনায়কের আক্রশের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেই সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। (১) ঢাকা এবং অন্যান্য জেলায় পুলিশি অত্যাচারের বাড়াবাড়ি খতিয়ে দেখতে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা। (২) পূর্ববাংলার ব্যবস্থা পরিষদে বাংলাভাষাকে অন্যতম একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করা। (৩) যদি পরিষদ প্রস্তাব দু'টিকে কার্যকর করতে ব্যর্থ হয় তাহলে পূর্ববঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভায় সকল সদস্যকে একযোগে পদত্যাগ করতে হবে। প্রস্তাব গ্রহণের পরেই মুজিব সবাই বিধান সভায় চলুন বলে সভার সমাপ্তি টানেন। উপস্থিত সবাই মুজিবের সাহসী পদক্ষেপ ও যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত

মেনে নেন এবং তাকে অনুসরণ করেন। সরকারের স্বৈরাচারি মনোভাবের বিরুদ্ধে এবং বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে প্রতিবাদ মুখর মিছিল এগিয়ে চলে। ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদী মানুষের মিছিল যত এগিয়ে যেতে থাকে পথে পথে ততই বাড়তে থাকে সংগ্রামী মানুষের অংশগ্রহণ। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও বিধানসভার মোড়ে পুলিশি হামলায় মিছিল ছত্রভঙ্গ করার চেষ্ঠা করলে খন্ডযুদ্ধ হয়। আইয়ুব খানের সক্রিয় সহায়তায় নাজিমুদ্দিন পালিয়ে যান। তিনি ছাত্রদের মুখোমুখি হতে সাহস পাননি। তার ধারণা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যুক্তিতর্কে তিনি নিশ্চিত হেরে যাবেন। এমনকি তাঁর কাছে তার কোনো অজুহাতই ধোপে টিকবে না।

অন্যদিকে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ২১ মার্চ সমাবেশে এবং ২৪ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ সাহেব বললেন, 'আমি আপনাদের সকলের কাছে স্পষ্ট করে বলতে চাই, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আমাদের দেশে একমাত্র উর্দুই চলবে, অন্য কোনো ভাষা নয়। যে কেউ এ নিয়ে আপনাদের ভুলপথে পরিচালিত করবে, তারা পাকিস্তানের শত্রু।' জিন্নাহ কিন্তু এই ভাষণটি পূর্ণ ইংরেজি ভাষায় দিয়েছেন। কারণ তিনিও ভালো উর্দুভাষা বলতে পারতেন না। নির্ভীক ভাষা সৈনিক মুজিব শুধু ভাষা-আন্দোলনেই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কর্মীদের উন্নত বেতন কাঠামো এবং নিয়োগসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সম্মান ও সমমর্যাদা সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে ছাত্রসমাজসহ শিক্ষক এবং অন্যান্য মহলেও মুজিবের মূল্যায়ন বহুগুন বেড়ে যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অমান্য করায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন সহকর্মীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতদের অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষের কাছে বন্ড দিয়ে শাস্তি মওকুফ করায়। চিরউন্নত শির শেখ মুজিব শর্ত স্বাক্ষরের মাধ্যমে কখনও কারো কাছে করুণা চাননি। তিনি তখন ভাষা-আন্দোলনকে আরো গতিশীল করার জন্য আন্দোলনের যাবতীয় কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরে থেকে পরিচালনা করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির রোষানলে পড়ে মুজিবকে আবার কারাবরণ করতে হয়। এ কারণে দীর্ঘদিন তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন।

১৯৪৯ সালে আরমানিটোলা মাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সভা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী। বিরাজমান দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকটের প্রতিবাদে আহুত সভায় মওলানা ভাসানী ছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন শেখ মুজিবসহ আরো অনেক নেতৃবৃন্দ। একদিকে ভাষা-

আন্দোলন, অন্যদিকে ক্ষুধার আগুনে দগ্ধ দারিদ্র অবস্থার অবসান ঘটাতে আন্দোলন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। সভা সমাবেশের শেষে মিছিল নিয়ে বের হওয়ার কারণে মিছিলের অগ্রভাগে থাকা সভাপতি মওলানা ভাসানী, সহ-সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকসহ আরো কয়েকজনকে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করে।

১৯৫২ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর কারাগার থেকে শেখ মুজিব মুক্তি পান। তৎকালীন পূর্ববাংলার সার্বিক পরিস্থিতিতে মুজিব বাইরে থাকলে ভাষা-আন্দোলনকে ক্রমাগত তীব্রতর করে তুলবে, তাতে সরকারের সমস্যা আরও বাড়বে এমন চিন্তা-ভাবনায় মুজিবকে গ্রেফতার করে। তারপর জনসাধারণের প্রচন্ড চাপের মুখে তাকে মুক্তি দিতেও বাধ্য হয়। ৫২'র ভাষা-আন্দোলনের জাগ্রত চেতনা বুকে ধরে দৃপ্ত পদক্ষেপে মুজিব ক্রমশ সামনে এগিয়ে চলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ক্রমে ক্রমে ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয় এবং বাংলাদেশ নামে একটি জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়। ৫২ থেকে ৭১ অতঃপর ৭৫ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবনের বহুমাত্রিক মহৎ কর্মকাণ্ড বাঙালি জাতির জন্য অমূল্য সম্পদ। এমন কী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন সে ভাষণ এখন বিশ্বপ্রামাণ্য দলিল হিসেবে জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত।

ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক অবদানের তথ্যভিত্তিক ইতিহাসের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ভাষাবিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে গাজীউল হক বলেন, 'সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লেখার বাহন ও

আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের ওপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।' এভাবেই ভাষার দাবি প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত থেকে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় প্রত্যাবর্তন করার পর সরাসরি ভাষা আন্দোলনে শরীক হন। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত কার্যক্রমে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবনীকার অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান এই মজলিসকে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বহুকাজে সাহায্য ও সমর্থন করেন'। তিনি ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে বাংলা ভাষার দাবির সপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলাকালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃত্বদান করেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সমকালীন রাজনীতিবিদসহ ১৪ জন ভাষাবীর সর্বপ্রথম ভাষা-আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবি সংবলিত ২১ দফা দাবি নিয়ে একটি ইস্তেহার প্রণয়ন করেছিলেন। ওই ইস্তেহারে ২১ দফা দাবির মধ্যে দ্বিতীয় দাবিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত। ঐতিহাসিক এই ইস্তেহারটি একটি ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল যার নাম 'রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইস্তেহার- ঐতিহাসিক দলিল।' উক্ত পুস্তিকাটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এই ইস্তেহার প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং তিনি ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরদাতা। ১৫০নং মোগলটুলীর 'ওয়ার্কাস ক্যাম্প' ছিল সে সময়ের প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মিলন কেন্দ্র। ওয়ার্কাস ক্যাম্পের কর্মীরা বাংলা ভাষাসহ পাকিস্তানের অন্যান্য বৈষম্যমূলক দিকগুলো জাতির সামনে তুলে ধরেন। ভাষা-আন্দোলনের সপক্ষের কর্মীবাহিনী এখানে নিয়মিত জমায়েত হতো এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার নানা কর্ম পরিকল্পনা এখানেই নেয়া হতো। শেখ মুজিব, শওকত আলী, কামরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিলেন এই ক্যাম্পের প্রাণশক্তি।

১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে পূর্ববাংলা আইন পরিষদ ভবন অভিমুখে এক মিছিল বের হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনের

বিস্ফোরণ পর্বে শেখ মুজিব কারাবন্দি ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক ময়দানে অনুপস্থিত থাকলেও জেলে বসেও নিয়মিত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতেন। এ প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক গাজীউল হক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন- '১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পর জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই '৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে জেলে থেকেই তিনি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।' ভাষাসৈনিক, প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী 'একুশকে নিয়ে কিছু স্মৃতি, কিছু কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'শেখ মুজিব ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ ফরিদপুর জেলে যাওয়ার আগে ও পরে ছাত্রলীগের একাধিক নেতার কাছে চিরকুট পাঠিয়েছেন।'

জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে বিপক্ষে অবদান নিয়েছিল। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিবৃতি দেন। সোহরাওয়ার্দী এই অবস্থানে দৃঢ় থাকলে ভাষা-আন্দোলনে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারত। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর এই মত পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন, 'সে সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষা সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা বেশ অসুবিধায় পড়ি। তাই ঐ বছর জুন মাসে আমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য করাচি যাই এবং তার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বাংলার দাবির সমর্থনে তাকে একটি বিবৃতি দিতে বলি।

১৯৫৩ সালে একুশের প্রথম বার্ষিকী পালনেও বঙ্গবন্ধুর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সে দিন সব আন্দোলন, মিছিল এবং নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়ার আহ্বান জানান এবং অবিলম্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে শেখ সাহেব সমকালীন রাজনীতি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়নে অবদান রাখেন। পরবর্তীকালেও শেখ মুজিব বাংলাভাষা ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের অধিকারের সেই একই দাবি ও কথাগুলো আরো বর্ধিত উচ্চারণে জাতির সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাভাষায় ভাষণ দিয়ে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তা

ইতিহাসের পাতায় চিরদিন অমলিন হয়ে থাকবে। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এটাই ছিল প্রথম সফল উদ্যোগ। ১৯৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত আইন পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু সংসদের দৈনন্দিন কার্যসূচি বাংলা ভাষায় মুদ্রণ করার দাবি জানান। একই সালের ৭ ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে তিনি খসড়া শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত জাতীয় ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, 'পূর্ববঙ্গে আমরা সরকারি ভাষা বলতে রাষ্ট্রীয় ভাষা বুঝি না। কাজেই খসড়া শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের ভাষা সম্পর্কে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হুকুম তলবে করা হয়েছে। পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ৫৬ ভাগ লোকই বাংলা ভাষায় কথা বলে, এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রশ্নে কোনো ধোঁকাবাজি করা যাবে না। পূর্ববঙ্গের জনগণের দাবি এই যে, বাংলাও রাষ্ট্রীয় ভাষা হোক। ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের আইন সভার অধিবেশনেও তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমান অফিসের কাজে বাংলাভাষা প্রচলনের প্রথম সরকারি নির্দেশ জারি করেন। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক জারিকৃত এক আদেশে বলা হয়, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, স্বাধীনতার তিন বছর পরও অধিকাংশ অফিস আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই, দেশের প্রতি যে তাঁর ভালোবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাঙালি কর্মচারীরা ইংরেজি ভাষায় নথি লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না।'

১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা একাডেমিতে একটি সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, 'ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু হবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করব না। কারণ তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনোদিনই বাংলা চালু করা সম্ভবপর হবে না। এ অবস্থায় হয়তো কিছু কিছু ভুল হবে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, এভাবেই অগ্রসর হতে হবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। এটাই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বাংলা ভাষায় প্রণীত সংবিধান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মূল নায়ক ও

স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভাষা-আন্দোলনেরই সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতি" (দৈনিক সংবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫)। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার এই ধারাবাহিক আন্দোলনের পথ ধরেই এসেছে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্থপতির ভূমিকা পালন করে আমাদের একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। 'বাংলাদেশ' নামের এ ভূখণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই স্বীকার করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু কীভাবে ভাষা-আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন, এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক মুনতাসীর মামুন রচিত 'বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন' গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে আরও অনেকের সাথে অন্নদাশঙ্কর রায় ঢাকা আসেন। কথা হয় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। অন্নদাশঙ্কর রায় লেখেন: 'শেখ সাহেবকে আমরা প্রশ্ন করি, 'বাংলাদেশের আইডিয়াটি প্রথম কবে আপনার মাথায় এল?' 'শুনবেন?' তিনি (বঙ্গবন্ধু) মুচকি হেসে বললেন, 'সেই ১৯৪৭ সালে। আমি সুহরবর্দী (সোহরাওয়ার্দী) সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালীর এক দেশ।... দিল্লী থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সুহরাবর্দী ও শরৎ বোস। কংগ্রেস বা মুসলিমলীগ কেউ রাজী নয় তাঁদের প্রস্তাবে।... তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই। কিন্তু আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা।... হঠাৎ একদিন রব উঠল, আমরা চাই বাংলাভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। পরে এমন একদিন আসে যেদিন আমি আমার দলের লোকদের জিজ্ঞেস করি, আমাদের দেশের নাম কী হবে? কেউ বলে, পাক বাংলা। কেউ বলে, পূর্ব বাংলা। আমি বলি, না বাংলাদেশ। তারপর আমি শ্লোগান দিই, 'জয়বাংলা'।... 'জয় বাংলা' বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির জয় বা সাম্প্রদায়িতকার ঊর্ধ্বে।

৪ মার্চ ঢাকা জেলা গোয়েন্দা তথ্যে বলা হয়, 'শেখ মুজিবুর রহমানসহ যারা মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে কাজ করেছে তারাই বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে লিফলেট ছড়াচ্ছে।' [ভলিউম-১, পৃষ্ঠা ৭]

৩ মার্চ গোপালগঞ্জে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের সম্মেলনে বাংলা ভাষার অধিকার নিয়ে কথা বলেন। গোপন নথিতে এ সম্পর্কে

বলা হচ্ছে: Sheikh Mujibur Rahman & other leaders delivered speeches in a meeting of the students over the Language Movement, which was held at the premises of the court mosque, Gopalganj on 3.3.1948. [fwjDg-1, c… 340]

[DIO, IBEB, Dacca submitted a report containing the particulars of the members of the provisional organizing committee of EPMSL including the name of Sheikh Mujibur Rahman, who was one of the signatories of the leaflet which advocated Bengali to be the State Language of Pakistan. (Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-7)]

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এই ধর্মঘট সফল করতে ১ মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে প্রচার মাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম, সম্পাদক তমদ্দুন মজলিস, শেখ মুজিবুর রহমান, কাউন্সিলের সদস্য, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ, নঈমুদ্দীন আহমদ আহ্বায়ক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, এবং আবদুর রহমান চৌধুরী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতা জাতীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসে এ বিবৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। এই ধর্মঘট পালনের আগের রাতে অর্থাৎ ১০ মার্চ রাতে ফজলুল হক হলে দিনটির কর্মসূচি নিয়ে একসভা বসে। পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে:

Secret information was received on 12.3.48 that the subject (Sheikh Mujibur Rahman) along with others took part in the discussions held at Fazlul Haq Hall on 10.3.48 and gave opinion in favour of violating section144 cr.p.c. on 11.3.48.

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পালিত এই ধর্মঘটটি ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম সফল ধর্মঘট। এই ধর্মঘটে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রেপ্তার হন। পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হচ্ছেঃ

[IB report on Sheikh Mujinur Rahman, who was arrested on 11.3.1948… This subject (Sheikh Mujibur Rahman) was arrested on 11.3.48 for violating the orders…He took very active part in the agitation for adopting Bengali as the State language of Pakistan, and made the propaganda at Dacca for general strike on 11.3.48 on this issue. (Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-7)]

দিনটি নিয়ে 'কারাগারের রোজনামচা'য় বঙ্গবন্ধু বলেনঃ 'প্রথম ভাষা আন্দোলন শুরু হয় ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (এখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ) ও তমদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে। ঐদিন ১০ টায় আমি, জনাব শামসুল হক সাহেবসহ প্রায় ৭৫ জন ছাত্র গ্রেপ্তার হই এবং আবদুল ওয়াদুদ-সহ অনেকেই ভীষণভাবে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হয়।' [কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা ২০৬]

ভাষাসৈনিক অলি আহাদ তাঁর 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫' গ্রন্থে লিখেছেনঃ 'আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ হতে ১০ মার্চ ঢাকায় আসেন।' ১১ মার্চের হরতাল কর্মসূচিতে যুবক শেখ মুজিব এতটাই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, এ হরতাল ও কর্মসূচি তার জীবনের গতিধারা নতুনভাবে প্রবাহিত করে। মোনায়েম সরকার সম্পাদিত বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, 'স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটিই তাঁর প্রথম গ্রেপ্তার।' শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৬ এপ্রিল গোপালগঞ্জে সর্বাত্মক হরতাল ডাকা হয়। এ নিয়ে ৩ এপ্রিল গোয়েন্দাদের দেওয়া এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৫ মার্চ গোপালগঞ্জে প্রায় চারশ' ছাত্র বিক্ষোভ করে। তারা সেই বিক্ষোভ থেকে ১৬ তারিখে শহরে দিনব্যাপী হরতাল ডাকে। তারা শেখ মুজিবুরের মুক্তির দাবিতে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্লোগান দেয়। [ভলিউম-১, পৃ ৮-৯]

[Extract from WCR of SP office, Faridpur, where it was mentioned that a complete hartal was announced at Gopalganj town on 16.3.1948 as a mark of protest against the arrest of Sheikh Mujibur Rahman. (Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-8)]

এই অংশে বিবৃতির নিচে 'সাইড নোট' লিখে ফের বলা হচ্ছেঃ Was Mujibur Rahman arrested in Dacca city in connection with the language controversy? Why did the Gopalganj students take up his cause? Ask Faridpur to clarify the latter point., Sd. S.K.G, 16/17.4.38

১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে পূর্ব-বাংলা আইন পরিষদ ভবন অভিমুখে এক মিছিল বের হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। এ প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদ লিখেছেনঃ 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বেলা দেড়টায় সভা শুরু হলো। মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করলেন। সংশোধনীগুলি গৃহীত হলো এবং অলি আহাদের মাধ্যমে তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হলো। [তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি ১৯৪৭-১৯৪৮, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩০]

বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ পাঠে জানা যায় '১৬ ই মার্চ আবার বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় সভা হয়, আমি সেই সভায় সভাপতিত্ব করি। আবার বিকালে আইনসভার সামনে লাঠিচার্জ হয় ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়। প্রতিবাদের বিষয় ছিল, 'নাজিমুদ্দীন সাহেবের তদন্ত চাই না, জুডিশিয়াল তদন্ত করতে হবে।' [কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা ২০৬] ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বানে নঈমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় শেখ মুজিব অংশগ্রহণ করেন। (১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫ অলি আহাদ)। '১৭ তারিখ-এ দেশব্যাপী শিক্ষায়তনে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেই ধর্মঘট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ১৭ মার্চ সন্ধ্যার পর ফজলুল হক হলে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'র সভা অনুষ্ঠিত হয়, এই সভায় শেখ মুজিবুর রহমান যোগদান করেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তিনি এ সভার উল্লেখ করেছেন।

১৯৪৯ সালের ৯ জানুয়ারি গোপন দলিলের ২৭ নাম্বার ভুক্তিতে দেখা যায় শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কার্যক্রমের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ ও চালু করার বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর একাধিক ভাষণে জোর দিয়েছেন।

[Addenda to the Brief history of Sheikh Mujibur Rahman, sent from SP, DIB Khulna to IBEB, Dacca, where a number of political activities of Sheikh Mujibur Rahman were mentioned. It was also reported that he delivered speeches demanding to adopt Bengali as court language…(Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-66)]

গোপন দলিলের ৪০ নাম্বার ভুক্তিতে উল্লেখ আছে, ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ সদরঘাট থেকে প্রায় দুইশজন ছাত্রের অংশগ্রহণে একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান, দবিরুল ইসলাম ও কল্যাণ দাস গুপ্ত নওয়াবপুর রোড হয়ে দুপুর ১২ টার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে আসেন। তার এক ঘণ্টা পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা জমায়েত হয়।

গোপন নথিতে প্রতিবেদনটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে এভাবে: Report of a procession brought out Sheikh Mujibur Rahman at Nowabpur road & Sadarghat area on 12.3.1949. A meeting of students held at Dacca University ground. Nadira Begum & other student leaders spoke in the meeting. All of them delivered their speeches in support of Bengali as state Language… …[Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-101]

গোপন নথির ১৫৪ নাম্বার ভুক্তিতে ১৯৪৯ সালের ১০ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানের সার্বিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর গোয়েন্দা নজরদারির সারবস্তু তুলে ধরা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে: 'He (Sheikh Mujibur Rahman) took a very active part in the agitation for adopting Bengali as the State language of Pakistan, and made propaganda at Dacca for general strike on 11.3.48. on this issue. On 11.3.48 the subject was arrested for violating orders under section 144 Cr. P.C. [Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, V-1, page-319]

বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'আজও আশা করে আছি পরিত্রাণ কর্তা আসবে সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে, চরম আশ্বাসের কথা শোনাবে পূর্ব দিগন্ত থেকেই।' বাঙালির ভাগ্যাকাশে সেই ত্রাণকর্তা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সচেতনভাবে বাঙালির কাছ থেকে ভাষার অধিকার হরণ করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল সংখ্যালঘু জনগণের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে। কিন্তু তাদের সেই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে গর্জে

উঠেছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রোষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই মহাকালের মহামানব স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরেছেন। লাখো শহিদের রক্তে রঞ্জিত ৫২,৭১,৭৫ এর সর্বাধিক মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাস বিকৃতির মহোৎসবের মাধ্যমে মুজিবকে আড়াল করার ব্যর্থ প্রচেষ্ঠা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। স্বাধীনতার শীর্ষবিন্দু স্পর্শী বহুমাত্রিক বঙ্গবন্ধুর অমর অক্ষয় কীর্তিতে, সুমধুর স্মৃতিতে, রক্তসিক্ত ইতিহাসে বাঙালির হৃদয়াসনে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন জন্মশত বর্ষের বিনম্র শ্রদ্ধায় পুষ্পিত ভালোবাসায়। তিনি স্মরণীয় বরণীয়। জাতিগত আত্মমর্যাদায় ও শ্রদ্ধায় যে পঞ্চ পুরুষ অগ্রদূত হয়ে আছেন তাঁরা হলেন- শ্রী চৈতন্য, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হউক।♦

তথ্যসুত্র:

১. *আবুল মোমেন, কালোত্তীর্ণ ভাষণ: ‘প্রস্তুতি ও প্রভাব’ শীর্ষক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ২০১৬*

২. *শামসুজ্জামান খান, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ: একটি অনুপুঙ্খ পাঠ, বাংলা একাডেমি, ২০১৪-১৫, পৃষ্ঠা- ২২*

৩. *অজয় রায়, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, আমার অনিয়মিত ভাবনা (প্রবন্ধ) শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ’ বাংলা একাডেমি ২০১৪-১৫ পৃষ্ঠা ৩৪৫*

৪. *নির্মলেন্দু গুণ ‘স্বাধীনতা এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো’ চাষাভূষার কাব্য (১৯৮১) (সংকলিত) কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা ২০০০।*

৫. *শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০১২: পৃষ্ঠা ৮*

৬. *১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ভাষণ*

৭. *Jacob F, fied. We shall fight on the Beaches. The speeches that Inspired Hitory. Michael O’mara Books Limited, London . 2013.*

ভাষা আন্দোলন ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম

ফয়সাল আহমেদ

সৈয়দ নজরুল ইসলাম। নানা গুণে গুণান্বিত এই মহামানব। তৎকালীন মহকুমা কিশোরগঞ্জের অজপাড়াগাঁ যশোদলে জন্ম নিয়েও নিজ কর্মগুণে রাজনীতির কেন্দ্রে উঠে এসেছেন তিনি। বীরদামপাড়ার এই বীর যোদ্ধা মানুষের ডাকে সারা দিয়েছেন সবসময়। হয়ে উঠেছিলেন গণমানুষের নেতা। কখনও কখনও তাঁকে অস্থির মনে হয়েছে বারংবার তাঁর পেশা বদলের কারণে, কিন্তু এ কথা চরমতম সত্য যে, তাঁর প্রকৃত জায়গা রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু থেকে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হননি। সরকারি চাকুরি, শিক্ষকতা, আইনপেশা, যখন যেখানেই যান না কেন, স্থির থেকেছেন রাজনীতিতেই। তিনি যে আপাদমস্তক রাজনীতিরই মানুষ। এই রাজনীতিতে তিনি যেমন বাংলার মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভালোবাসাও। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বন্ধু বলে পরিচয় দিতেন। তাঁকে সম্মান করতেন। তিনি ছিলেন জাতির পিতার বিশ্বস্ত সহচর, সহযোদ্ধা। বঙ্গবন্ধু যেমনটা তাঁকে বিশ্বাস করতেন, সেই বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি জীবন দিয়ে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। আর তা পেরেছেন এজন্য যে, তিনি ছিলেন নীতির প্রশ্নে আপোসহীন। তিনিই বাংলার মানুষের প্রাণের বুলবুল—সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বাংলার মানুষ তাঁকে

ভালোবেসে স্লোগান তুলত—বাংলার বুলবুল, সৈয়দ নজরুল। নিকটজনদের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় গোলাপ ভাই। জন্মের সময় তাঁর বাবা নাম রেখেছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম গোলাপ। কাঁদা মাটির সোঁদা গন্ধ গায়ে মেখে জনগণের মাঝে থেকে তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন। হয়ত তিনি জানতেনও বাংলার মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে তাঁকেই হয়ে উঠতে হবে অন্যতম কাণ্ডারি। তিনি শুধু বঙ্গবন্ধুর কাছেই প্রিয় ছিলেন না, তাঁর অপরাপর সহযোদ্ধা তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামারুজ্জামানসহ অন্যদের কাছেও গ্রহণযোগ্য ও সম্মানীয় ছিলেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪-র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-র ছয় দফা, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ৭০-র সাধারণ নির্বাচন, ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাঙালি জাতির প্রতিটি আন্দোলন, লড়াই সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তাঁর বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নায়ক হয়ে উঠার মূলভিত্তি স্থাপিত হয় ৫২'এর ভাষা আন্দোলনেই।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে সিদ্ধান্ত ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পূর্বেই গ্রহণ করে রেখেছিলেন, কিন্তু সমস্যা তৈরি হলো পাকিস্তানের বেলায়। কারণ পাকিস্তান সরকার তার সিংহভাগ জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে অন্য একটি ভাষা তাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইল। চাইলেই কী হয়? মেনে নিল না পূর্ববাংলার বীর-জনতা। তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল উর্দু নয় বাংলা এবং শুধু বাংলাই হবে রাষ্ট্রভাষা। বেঁধে যায় তুমূল বিরোধ।

সে সময় আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দীন আহম্মদ এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হওয়া উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করলে বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। ধীরে ধীরে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা পূর্ববাংলায়। সেই থেকে শুরু।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে যখন পূর্ববাংলার উপর অযাচিতভাবে চাপিয়ে দিতে চাইল, তখনই ঘুরে দাঁড়ায় বাংলার ছাত্রসমাজ। অন্য অনেকের মতো সেদিনের তরুণ ছাত্রনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলামও যোগ দেন রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে। মহান ভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অনন্য। সেদিনের সেই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের হয়ে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। ২ মার্চ ১৯৪৮ সালে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে আয়োজিত এক সভায় পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, গণ আজাদী লীগসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটিতেও ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি।

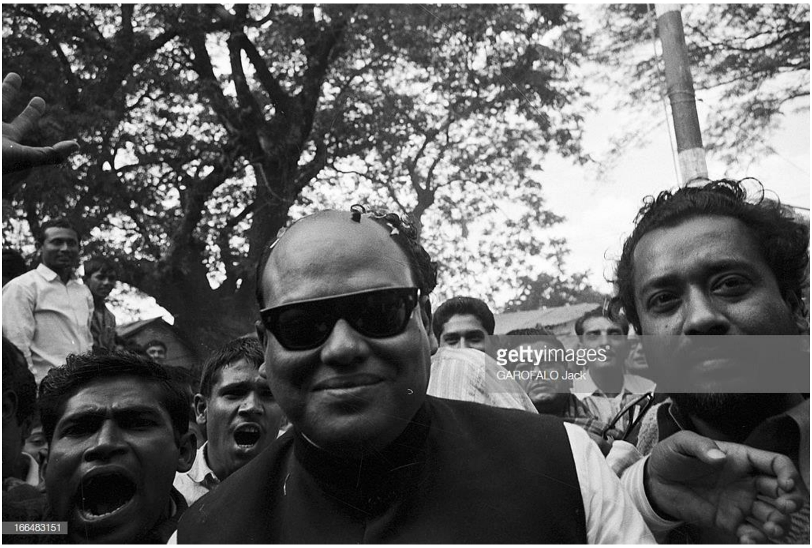

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন চলছে, খাজা নাজিমুদ্দীন তখন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। জানা গেল, ১৯ মার্চ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসবেন। খাজা নাজিমুদ্দীন তখন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদের কাছে ৮-দফা শান্তি প্রস্তাব দেন। তাঁর ভয় ছিল, ওই সময় গভর্নর জেনারেল ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে পড়লে তাঁর রাজনৈতিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই সংগ্রাম পরিষদের কাছে তাঁর এই শান্তি প্রস্তাব। মুখ্যমন্ত্রীর শান্তি প্রস্তাব সাগ্রহে মেনে নেয় দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৫ মার্চ থেকে আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯ মার্চ বিকালে ঢাকায় আসেন জিন্নাহ। হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখার জন্য তেজগাঁও বিমানবন্দরে সমবেত হয়। তাঁর এই আগমনে ছাত্রদের ও রাজনৈতিক মহলে একধরনের আশঙ্কা তৈরি হয়, পরবর্তীতে সে আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হয়।

২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান-সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) নাগরিক সংবর্ধনা সভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এরপর ২৪ মার্চ সকালে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত বিশেষ সমাবর্তনে দেওয়া দীর্ঘ বক্তব্যে তিনি আবারও ২১ মার্চ দেওয়া বক্তব্যের পূনরাবৃত্তি করলেন। কার্জন হলে উপস্থিত কিছুসংখ্যক ছাত্র তখনই 'নো-নো' বলে প্রতিবাদ করে ওঠেন। জিন্নাহর এ বক্তৃতা ছাত্রসমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এদিন সন্ধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমেদের সরকারি বাসভবনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যে বৈঠক হয় সেখানেও উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সেদিনের বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন শামসুল হক, কামরুদ্দিন আহ্মদ, অধ্যপক আবুল কাসেম, শামসুল আলম, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ। সেদিনের সেই সভা থেকে জিন্নাহকে একটি স্মারকলিপিও দেয়া হয়।

কিন্তু সভাটি শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়নি। জিন্নাহর সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদ নেতৃবৃন্দের তর্ক বাঁধে। জিন্নাহ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। তিনি বলেন, খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা আমি মানি না। কারণ চুক্তিতে তার সই জোর করে নেওয়া হয়েছে। একতরফা এই চুক্তি সম্পূর্ণ অবৈধ।

রাষ্টভাষা বাংলার সমর্থনে গড়ে ওঠা সেই আন্দোলনে সৈয়দ নজরুল ইসলামের অসামান্য অবদান ছিল। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি এবং পরে, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক হিশেবে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৫২সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ময়মনসিংহে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথেও যুক্ত ছিলেন তিনি।♦

লাহোরে ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ও আই সি ইসলামী সম্মেলনে প্রদত্ত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর পূর্ণাঙ্গ ভাষণ

২৪ ফেব্রুয়ারির ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি'র ইসলামী সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের যোগদান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সে সম্মেলনে যোগদানের আগে পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশকে অনন্য মর্যাদায় উন্নীত করে। ওআইসি'র সেই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ভাষণটি আমরা এ সংখ্যায় পুনমুদ্রণ করলাম।—সম্পাদক

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দান করেন, নিম্নে উহার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল :

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ এখানে সমবেত ভাইদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ ও আরব ভাইদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে তাহাদের সমর্থন ঘোষণার জন্য এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিতে পারায় আমরা খুবই আনন্দিত।

সেক্রেটারি জেনারেলসহ অন্যান্য যাঁহারা আমাদের ভাইদের পার্শ্বে আজ আমাদের উপস্থিতির আয়োজন করিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করিয়াছেন, আমি তাহাদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যে মহামান্য নেতৃবৃন্দ আজ আমাদের স্বাগত জানাই, দেখেন আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ আমাদের মেজবান ও সম্মেলনের চেয়ারম্যান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে। আমি বলিতে চাই, সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হইয়াছে। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুগপৎ অবদান রাখার পথ উন্মুক্ত করিয়াছি।

আজিকার মত মানবজাতি ইতিপূর্বে কখনও এতবড় কঠোর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় নাই। একদিকে ভয়াবহ বিপদ আর অপরদিকে জীবনের মানোন্নয়নে সৃজনশীল বিপুল সম্ভাবনা– বিশ্বের মানুষ ইতিপূর্বে এমন পরিস্থিতির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় নাই। মানুষ এখন বস্তুগত দিক হইতে বৃহত্তর শক্তি অর্জন করিয়াছে যাহা সে আর কখনও পারে নাই। সে পৃথিবীকে ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। আমরা যুদ্ধের জন্য শক্তি অপচয় করিতে দেখিয়াছি, জনগণকে নিপীড়ন করিতে দেখিয়াছি। আমরা তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অস্বীকার করিতে দেখিয়াছি। অকথ্য দুর্ভোগের প্রান্তে তাদের ঠেলিয়া দিতেও আমরা দেখিয়াছি। আর এইসব অবর্ণনীয় যাতনার চূড়ান্ত নিদর্শন হইয়া রহিয়াছেন আমাদের ফিলিস্তিনী ভাইয়েরা।

আর এই জন্যই অতীতের তুলনায় আজ শক্তিকে প্রজ্ঞার সহিত কাজে লাগানোর প্রয়োজন বেশি। ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি, দুর্ভোগ নয় মানুষের কল্যাণে আমাদের করিতে হইবে। আমরা যদি মহানবীর প্রচারিত মানব প্রেম ও মর্যাদার শাশ্বত মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে সত্যায়িত করিতে পারি তাহা হইতে বর্তমানকালের সমস্যা সমাধানে মুসলিম জনসাধারণ সুস্পষ্ট অবদান রাখিতে সক্ষম হইবে।

এইসব মূল্যবোধে উদ্দীপিত হইয়া শান্তি ও তার বিচারের ভিত্তিতে আমরা একই নূতন আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলিতে পারি। এই সম্মেলন শুধুমাত্র আরব

ভাইয়ের সংগ্রামের প্রতি সমর্থনে আমাদের ঐক্য সংহত করার জন্যই নয়। বরং জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির সহিত বিশ্বব্যাপী শান্তি ও প্রগতিশীল শান্তিসমূহের সঙ্গে আমাদের একাত্ম ঘোষণার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ ও সকল প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে একাত্মতার উপর জোর দিতে হইবে। আমাদের ভাইদের উপর যে নিদারুন অবিচার হইয়াছে অবশ্যই উহার অবসান ঘটাইতে হইবে।

ইসলামী শীর্ষসম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা

ইসরাইলকে আরবভূমি ছাড়িতেই হইবে

আমরা সংগ্রামী আরব ভাইদের পাশে আছি

লাহোর, ২৩শে ফেব্রুয়ারী— প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, "আরব ভাইদের" হৃতভূমি পুনরুদ্ধার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলাদেশ সর্বতোভাবে সমর্থন করিবে। আরবদের সমর্থনে এই দ্ব্যর্থহীন

বঙ্গবন্ধু বলেন, "আল্লাহর রহমতে আমরা সাফল্য অর্জন করার মত অবস্থায় পৌছিয়াছি।" বঙ্গবন্ধু মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, ইসরাইলকে অবৈধভাবে দখলীকৃত আরবভূমি অবশ্যই ছাড়িয়া দিতে হইবে। তিনি বলেন যে, অধিকৃত

আরবভূমি হইতে সম্পূর্ণভাবে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার করা হইলেই মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অবিলম্বে প্যালেস্টাইনীদের ন্যায্য অধিকার প্রদানের জন্যও তিনি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু সম্মেলনে বলেন যে,

বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদানের ফলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়া অধ্যায়ের সূচনা হইল। বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমরা উপমহাদেশে শান্তি স্থাপনের পথ প্রশস্ত করিয়াছি"। এই ব্যাপারে সঠিক (শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

অন্যায়ভাবে দখলকৃত আরব ভূখণ্ড অবশ্যই ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে জেরুজালেমের উপর। রমজান যুদ্ধের অকুতোভয় বীর শহীদানের প্রতি আমরা সালাম জানাই। তাঁহারা তাঁহাদের শৌর্য ও আত্মত্যাগের দ্বারা বহু অমূলক ধারণা ধূলিসাৎ করিয়া এমন একটি নয়া কার্যকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে এই কথাই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে য়ে, ন্যায়বিচার ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বিজয় অবধারিত।

আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করি যে, ইতিহাস একটি ক্রান্তি লগ্নে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমরা আমাদের সম্মিলিত ও সুচিন্তিত কার্যক্রম দ্বারা আমাদের ভাইদের উপর চালিত অবিচারের অবসান ঘটাইতে পারিব।

আল্লাহর কৃপায় আমরা এখন আমাদের সম্পদ ও শক্তি এমনভাবে সংহত করিতে পারি, যাহাতে আমাদের সকলের জন্য শান্তি ও ন্যায়বিচার অর্জন করা যায়।

এই সাফল্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সকল যুক্ত প্রচেষ্টা সফল করুন। ধন্যবাদ, জনাব চেয়ারম্যান।◆

সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক।

জাস্টিন প্যারোট

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব-প্রসঙ্গ

মূল : জাস্টিন প্যারোট

অনুবাদ : মুস্তাফা মাসুদ

অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও কৌতূহলোদ্দীপক এই প্রবন্ধটির লেখক নওমুসলিম জাস্টিন প্যারোট। ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ২০০৪ সালে বিশ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় আবু আমিনা ইলিয়াস; যদিও লেখক হিসেবে জাস্টিন প্যারোটই অব্যাহত রেখেছেন। পদার্থবিজ্ঞান ও ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক এবং ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার ডিগ্রিধারী জাস্টিন বর্তমানে আবুধাবির নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে মিড্‌ল ইস্ট স্টাডিজ বিষয়ে রিসার্চ লাইব্রেরিয়ান। বর্তমান প্রবন্ধটি লেখকের `The Case for Allah's Existence in the Quran and Sunnah'-এর অনুবাদ; ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত পবিত্র কুরআনের আয়াতের ইংরেজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত ও প্রকাশিত 'আল-কুরআনুল করীম'-এর বাংলা অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে; অবশ্য ভাষা 'সাধু' রীতির পরিবর্তে 'চলিত' রীতিতে পরিবর্তন করা হয়েছে।

'তথ্যসূত্র' অংশটি বাংলায় অনুবাদ করা হলো না একারণে যে, এর মধ্যে অনেক শব্দ/টার্ম আছে– যেগুলো বাংলা বানান ও উচ্চারণে বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা আছে। তদুপরি, অনুসন্ধিৎসু পাঠক/গবেষকগণ রেফারেন্স যাচাই করতে চাইলে বা সংশ্লিষ্ট মূল গ্রন্থটি পড়তে/দেখতে চাইলে সেক্ষেত্রে মূল ইংরেজিটাই তাঁদের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হবে।– অনুবাদক

(গত সংখ্যার পর)

সাধারণ বুদ্ধিতেই আমরা বুঝতে পারি যে, অবশ্যই ওই জাহাজ অথবা পানিচালিত সেচযন্ত্র চলার জন্য বাইরের কারো দ্বারা বানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলির সায় রয়েছে এতে। প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটনের গতির প্রথম সূত্র বলছে: ''বাইরে থেকে কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ না করলে, স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরল রেখায় বা সোজাপথে চলতে থাকে।''[৪২] অন্য কথায়: মহাবিশ্বের কোনো বস্তুই নড়ে না বা তাদের গতি পরিবর্তন করে না যতক্ষণ না বাইরের কোনো বল তাদের উপর প্রয়োগ করা হয়। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর জন্যই এটি সত্য, এবং সার্বিকভাবে মহাবিশ্বের জন্যও নিশ্চিত সত্য।

যারা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তারা মহাবিশ্বের এক সুনির্দিষ্ট আরম্ভ আছে– স্বতঃলব্ধ এই পূর্বধারণাকে চ্যালেঞ্জের চেষ্টা করে। তাদের অভিমত এই যে: মহাবিশ্ব এক সীমাহীন ধারাবাহিক কার্যকারণের মধ্যে সব সময়ই অস্তিত্ববান রয়েছে; অথবা প্রথম কার্যকারণের (স্রষ্টা) প্রয়োজন ব্যতীতই এক অসীম পশ্চাতগতি মহাবিশ্বকে গতিতে সংস্থাপিত করেছে। পক্ষান্তরে, বিপরীত অন্তর্জাত বোধ এরকম: আমাদের জীবনে আমরা যেসব বস্তু দেখি, তাদের সবারই কোনো না কোনোভাবে শুরু আছে– আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও মহাজাগতিক বিজ্ঞান বর্তমানে মহাজাগতিক জ্ঞানের পূর্বধারণাকৃত মতকে বহুলাংশে সত্য বলে স্বীকার করছে। মহাসম্প্রসারণবাদ বা বিগ ব্যাং থিয়োরি স্বীকার করছে যে, কোনো এক অদ্বিতীয় উৎস থেকে ১২/১৪ বিলিয়ন বছর আগে কোথাও মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল।[৪৩] এমনকি, তর্কের খাতিরে এবং বৈজ্ঞানিক বা সজ্ঞাজাত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবহেতু আমরা যদি পশ্চাতগতির ধারণাকে স্বীকার করেও নিই, তবুও এর উৎপত্তি ও একে টিকিয়ে রাখার জন্য সময় ও স্থানের বাইরে এক অনিবার্য কার্যকারণের প্রয়োজনীয়তা নাকচ হয়ে যায় না। বহু বিদ্যাবিশারদ এবং দার্শনিক

জি. ডব্লিউ. লিবনিজ (মৃত্যু: ১৭১৬ খ্রি.) নিশ্চিত করছেন যে, আবশ্যম্ভাবীয়ভাবে এক অসীম পরম্পরার অস্তিত্বের যথেষ্ট কারণ এখনো রয়েছে: ''ধরুন: জ্যামিতির উপাদানগুলি নিয়ে লেখা একটি বই সর্বদা বিদ্যমান রয়েছে, এর একটি অনুলিপি সব সময় অন্যটি থেকে তৈরি। এটি সুস্পষ্ট যে, পূর্ববর্তী যে বই থেকে অনুলিপি করা হয়েছিল, সেখানকার বইটির একটি বর্তমান অনুলিপি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারলেও, তা থেকে কখনোই আমরা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাব না; এখানে এ বিষয়টি ধর্তব্য নয় যে– পেছনের কতগুলি বই আমরা পড়েছি। যেহেতু আমরা সর্বদা বিস্ময় প্রকাশ করতে পারি– কেন সব সময় এরূপ বই ছিল, কেন বইগুলি লেখা হয়েছিল এবং কেন সেগুলি সেভাবে লেখা হয়েছিল। এই বইগুলিতে বিধৃত যে সত্য, তা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষেও সত্য; কারণ, যে রাষ্ট্রে তা অনুসৃত হয়েছে, তা এক অর্থে পূর্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে অনুলিপি করা হয়েছে, যদিও এই অনুলিপিতে পরিবর্তনের কিছু নির্দিষ্ট বিধিমালা মেনে চলা হয়েছে; এবং সেজন্য যদিও আমরা যতদূর সম্ভব পেছনে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রগুলিতে যেতে পারি, সেখানে কখনোই আমরা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা (অনুপাত) খুঁজে পাব না কেন, সত্যিই সেখানে আদৌ কোনো পৃথিবী আছে কিনা, কেন এটি এভাবে হচ্ছে... এ থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, আমরা একে যদি পৃথিবীর অবিনশ্বরতা বলে ধরেও নিই, তবুও চূড়ান্ত ও অপার্থিব কারণকে আমরা এক পরমসত্তার (আল্লাহর) জন্য এড়িয়ে যেতে পারি না।''[৪৪]

একই ধারায়, পদার্থবিজ্ঞানী ডন পেজ ক্যানভাসের উপর একটি বৃত্তের ড্রয়িং অঙ্কনরত এক শিল্পীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন; বৃত্তটির কোনো আরম্ভ কিংবা শেষ নেই; তথাপি তা অঙ্কনের জন্য নিশ্চিতভাবে একজন বাইরের শিল্পীর প্রয়োজন পড়ে।[৪৫] নিজে থেকে মহাবিশ্বের বিদ্যমানতা– হোক তা সসীম বা অসীম প্রকৃতির, তাকে গতির কার্যকারণে সংস্থাপিত করতে অবশ্যই একজন স্রষ্টা ছিলেন।

তথাপি মহাবিশ্বতত্ত্বসংক্রান্ত যুক্তি নিজেই অস্তিত্বের প্রকৃতির উপর বৃহত্তর আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে স্রেফ একটি খণ্ডমাত্র। পবিত্র কুরআন আরও বৃহত্তর ও অধিকতর বাধ্যকারী ও মহাকারণমূলক আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করছে এভাবে– বিশ্বজগৎ নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে সৃষ্টি হয়েছিল।

পরমকারণতাত্ত্বিক আলোচনা

দীর্ঘপ্রলম্বিত নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবজগৎ পর্যন্ত মহাবিশ্বের কাঠমোর মধ্যে এবং এ দুয়ের মধ্যে বিদ্যমান প্রতিটি বস্তুর মধ্যে রয়েছে সর্বজনীন, প্রাকৃতিক বিধিপরম্পরা– যা শৃঙ্খলা বজায় রাখে। এই বিধিসমূহের

ফল এই যে, মহাবিশ্বের বহু জিনিস শনাক্তযোগ্য উদ্দেশ্য প্রদর্শন করে। আমাদের চোখদুটো তৈরি হয়েছিল দেখার জন্য। আমাদের কানদুটো তৈরি হয়েছিল শোনার জন্য। আমাদের ফুসফুসদুটো তৈরি হয়েছিল শ্বাস নেওয়ার জন্য। আমাদের বৃক্ষরাজি তৈরি হয়েছিল ফল এবং নির্মল বায়ু উৎপাদনের জন্য। আমাদের পানি তৈরি হয়েছিল জীবন রক্ষা এবং ইত্যাকার নানান উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্যটির এতসব সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত, যা আমরা বারবার মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশে অনুভব করি; উপসংহার টানতে এ কথাটি কেবল যুক্তিযুক্ত যে, সমগ্র মহাবিশ্ব নিজেই একটি উদ্দেশ্য হিসেবেই অস্তিত্ববান। বস্তুত, দৈনন্দিন জীবনে এবং বিশেষ করে জীববিজ্ঞানে পরমকারণতাত্ত্বিক ভাষাকে এড়িয়ে চলবার উপায় নেই। জীববিজ্ঞানী এবং চিকিৎসা পেশাজীবীগণ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ‘ভূমিকা’ ও ‘কাজ’-এর কথা বলে থাকেন (কে এর ‘ভূমিকা’ ও ‘কাজ’ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন?); অনুরূপভাবে তারা বলে থাকেন বংশগতির ‘সংকেত’ (জেনেটিক কোড) ও ‘তথ্য’-এর কথা (কে তাকে সংকেতায়িত ও তথ্য প্রদান করেছে?)। ঘোর নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক হিসেবে চার্লস ডারউইন নিজেই নিজের নাম প্রায়শই জোরেশোরে জাহির করতেন, তিনি পর্যন্ত পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের ভাষায় সংলাপ না করে তার বৈজ্ঞানিক ধারণা জানাতে পারতেন না।[৪৬] মহাবিশ্বের পরমকারণতত্ত্বকে স্বীকার করে নেওয়া আমাদের জন্য স্বাভাবিক ও সজ্ঞাত।

তদনুসারে, পবিত্র কুরআন প্রকৃতির নিদর্শনাবলির (আয়াত) প্রতি নিবিড়ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা মহান স্রষ্টার মহাপরিকল্পনা ও শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে। আমাদের উদ্দেশ্যের স্বীকৃতি এবং বিশ্বাস অর্জনের উপায় হিসেবে এসব নিদর্শনের ওপর চিন্তাশীল গবেষণায় (তাফাক্কুর) সম্পৃক্ত হতে আমাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেন: ‘‘আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি থেকে রক্ষা করো।’’[৪৭]

সত্য বিশ্বাস তাই যুক্তি ত্যাগের কারণ নয়, যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বাহ্যত যে বিভাজনরেখা টানা হয় তা সত্য নয়;[৪৮] বরং পরিশুদ্ধ অন্তরের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে যুক্তির শক্তিকে ব্যবহার করাই আল্লাহর পথ এবং ইসলামি গুণ। ইসলামের প্রাথমিক যুগের একজন মুসলমান–

আবু ‘আল ‘আলা সচরাচর বলতেন, ‘‘ইসলাম গ্রহণের পর পরিশুদ্ধ অন্তর ব্যতীত ইবাদতকারীকে উৎকৃষ্টতর আর কিছু দেওয়া হয় না।’’[৪৯]

এদিকে পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে তার পাঠকদেরকে যুক্তির (আল-‘আকল) প্রতি, বিশেষত পরমকারণতাত্ত্বিক অস্তিত্বের উপর গভীর চিন্তাভাবনার অনুরোধ জানায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, ‘‘নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা-সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।[৫০]

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আরও বলেন, ‘‘তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ।

আর তাঁর নির্দেশাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে।

‘‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

‘‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁর অনুগ্রহ থেকে। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

‘‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে– তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ ভয় ও ভরসাসঞ্চারকরূপে এবং আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন ও তার দ্বারা ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।’’[৫১]

আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘‘পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর-সংলগ্ন ভূখণ্ড, তাতে আছে আঙ্গুর-বাগান, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খেজুর গাছ সিঞ্চিত একই পানিতে, এবং ফল হিসাবে সেগুলোর কতককে কতকের ওপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।’’[৫২]

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেছেন, ‘‘তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য এবং চাঁদকে; আর তারকারাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন।’’ [৫৩]

আমরা সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে যাকিছু দেখি তার প্রতিটিতেই আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে– এগুলো হলোঃ সূর্য, চন্দ্র, তারকামণ্ডলী, গ্রহরাজি, রাত ও দিন, পর্বতমালা, সাগরসমূহ, বাতাস, মেঘমালা, বৃষ্টিধারা প্রতিটি বৃক্ষলতা ও প্রাণী, সর্বপ্রকারের ফলমূল, খাদ্য ও পানীয়, মানব-জেনোমের অলৌকিক বিস্ময়; প্রেম, প্রজ্ঞা এবং সৌন্দর্যের মতো গুণাবলি, এবং আমাদের গণনার বাইরেরও অনেক

কিছু। আমরা এসব নিদর্শন যত বেশি পরীক্ষা করব এবং এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করব, আমাদের ঈমানও তত বেশি শক্তিশালী হবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, ''আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ওটাই সত্য। তা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত?''[৫৪]

প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহর কাজের নিদর্শনগুলি গুরুত্বের সাথে প্রতিভাসিত করা স্রষ্টার অস্তিত্ব নিশ্চিত করার মৌলিক ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যৌক্তিক পদ্ধতি। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ লিখছেন, ''নিদর্শনাবলির সাহায্যে স্রষ্টাকে নিশ্চিত করা একটি বাধ্যবাধকতা, যেমনটি পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছে তা সজ্ঞাজাত করেছেন। যদিও অবরোহী যুক্তিগুলি সঠিক হতে পারে, তবে সেগুলোর উপযোগিতার অভাব রয়েছে।''[৫৫] আরও জটিল দার্শনিক যুক্তি, যদিও অগত্যা ভুল নয়, ততটা শক্তিশালী নয় যেহেতু বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ দার্শনিক যুক্তির পরিভাষা ও পদ্ধতিগুলিতে প্রশিক্ষিত নয়। একই অনুচ্ছেদে ইবনে সিনা (ইন্তিকাল: ১০৩৭ খ্রি.), আল-রাজি (ইন্তিকাল: ১২১০ খ্রি.), এবং অন্যরা, যাঁরা আল্লাহর অস্তিত্বের সপক্ষে নিরেট দার্শনিক যুক্তি তুলে ধরেছিলেন, ইবনে তাইমিয়্যাহ তাঁদের সমালোচনা করেছেন।

এই ধারার পাশাপাশি, মহান ইমামদেরকে প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা হতো– তাঁরা কেন সর্বাগ্রে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, এবং তাঁরা সে-প্রশ্নের জবাব দিতেন আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি মনোযোগের আহ্বান জানিয়ে।

ইমাম মালিক (র) [ইন্তিকাল: ৭৯৫ খ্রি.]-কে খলিফা হারুন-অর-রশীদ স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবং (জবাবে) মালিক (র) খলিফাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বর এবং বিভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন সুরের মধ্যে তার প্রমাণ খুঁজতে বলেছিলেন।[৫৬]

ইমাম আল-শাফীই (ইন্তিকাল: ৮২০ খ্রি.)-কে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ''একটি রসাল ফলের বাগানের গাছের সবগুলো পাতার স্বাদ একইরকম হয়। রেশম পোকারা তা খায় এবং রেশম উৎপাদন করে। মৌমাছিরা তা খায় এবং মধু উৎপাদন করে। ছাগল, উট এবং গরুরা তা খায় এবং সন্তান প্রসব করে। হরিণ তা খায় এবং কস্তুরী উৎপাদন করে; যদিও একটি জিনিস থেকেই সবগুলো আসে।''[৫৭] একটি ঝোপের

পাতাগুলোর সাধারণ মু'জিযা, এবং তৎসৃষ্ট অন্যান্য প্রতিটি মু'জিযা নির্দেশ করে যে, এই বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই তা পরিকল্পিত হয়েছিল।

ইমাম আহমদ (র) [ইন্তিকাল: ৮৫৫ খ্রি.]-কে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং তিনি জবাবে বলেছিলেন, ''কোনো দরজা বা বহির্গমন পথ ছাড়াই একটি মসৃণ, দুর্ভেদ্য দুর্গের কথা চিন্তা করুন। এর বাইরের দিকটা সাদা রুপার মতো এবং ভেতরটা খাঁটি সোনার মতো। এটি এভাবে নির্মিত এবং, দেখুন! এর দেয়ালগুলো ফেটে গেছে এবং সেই ফাটল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে একটি প্রাণী, যেটি দেখতে সুন্দর এবং তার কণ্ঠস্বরও মনকাড়া।[৫৮] এখানে আহমদ (র) মায়ের ডিম থেকে বেরুনো একটি মুরগিছানার প্রাকৃতিক বিস্ময়ের কথা উল্লেখ করছিলেন।

আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে থাকা শক্তিশালী প্রমাণ অনুধাবন করতে এবং সেগুলোয় বিশ্বাস স্থাপন করতে কোনো বিশেষায়িত দার্শনিক প্রশিক্ষণ বা জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না; যেমনটি আমরা বলেছি– এগুলোকে স্বীকার করে নেওয়া স্বাভাবিক ও স্বজ্ঞাজাত। সুপরিচিত একটি গল্পে আছে– যাযাবর উপজাতির (যারা সাধারণত লেখাপড়া জানে না) সদস্য এক বেদুইনকে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ''প্রশংসা আল্লাহর! উটের মলগুলি উটের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় আর পদচিহ্নগুলি পদবিক্ষেপকারীর সাক্ষ্য দেয়। আকাশ– যে তারকামণ্ডলীকে ধরে রেখেছে; একটি ভূমি– যার রয়েছে তৃণাচ্ছাদিত অংশ; এবং একটি সাগর– যার রয়েছে তরঙ্গমালা; এই সবই কি মহাজ্ঞানী মহান অধীশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় না?''[৫৯]

এমনকি, মহাকারণতাত্ত্বিক যুক্তির সারল্য ইবনে মু'তাজ (মৃত্যু: ৯০৮ খ্রি.) তাঁর কাব্যালঙ্কৃত সংক্ষিপ্ত পঙ্‌ক্তিমালায় তুলে ধরেছেন:

''আশ্চর্য, কীভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করা হচ্ছে,
এবং আশ্চর্য বিতর্ক সৃষ্টিকারীদের বিতর্ক,
সবকিছুতেই রয়েছে নিদর্শন,
দেখাতে যে– আল্লাহই অদ্বিতীয়।''[৬০]

ইবনে খাতির (ইন্তিকাল: ১৩৭৩ খ্রি.) এসকল কিছু উল্লেখ করার পর তাঁর সংক্ষিপ্ত কাহিনির ব্যাখ্যায় আরও মন্তব্য করেছেন:''উপকারিতা-সহ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত নদীসমূহ, এবং আল্লাহ যা কিছু উৎপন্ন করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণী, এবং বিভিন্ন স্বাদ, গন্ধ, আকার ও বর্ণের উদ্ভিদ থেকে এবং মাটি ও পানির মিলনে; এসবই স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং এসবই তাঁর অসামান্য ক্ষমতা,

তাঁর সৃষ্টির সাথে তাঁর প্রজ্ঞা ও করুণা, তাঁর দয়াশীলতা, সদয় আচরণ, এবং তাদের সাথে তাঁর হিতসাধনেচ্ছা প্রকাশ করে। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তাঁর মতো কোনো প্রতিপালক নেই। আমি তাঁর উপর নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ এ বিষয়ে প্রচুর নির্দেশনা দিচ্ছে।''[৬১]

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ এ মত গ্রহণ করতে পারে যে, বিশ্বজগৎ সত্যিই পরিকল্পিত হয়েছিল; কিন্তু কেন মাত্র একজন স্রষ্টা হবেন? কেন ভিন্ন ভিন্ন অনেক দেবদেবী নেই? এই প্রশ্নের উত্তর এই সত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে যে– মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়মবিধি তাদের উদ্দেশ্যসাধনে সুচিন্তিত, সঙ্গতিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, ''যদি আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা থেকে 'আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।''[৬২]

মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তি সমবেতভাবে এক অভিন্ন পরিণতির উদ্দেশ্যে কাজ করে, তা হলো: পৃথিবীর সৃষ্টি এবং জীবনকে রক্ষা করা। আমরা অনুমান করতে পারি যে, এই সবকিছুরই পেছনে রয়েছে এক অদ্বিতীয় বিচক্ষণ শক্তি। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে– এক অভিন্ন ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্যে এক দেবতা মহাকর্ষ সৃষ্টি করেছেন, অন্যজন তড়িৎচুম্বকশক্তি সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যরা অন্যান্য প্রতিটি প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

বৈজ্ঞানিক সপ্রমাণতা

বিজ্ঞান যেহেতু উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অগ্রগতি লাভ করেছে, আমরা এখন প্রাকৃতিক বিধিবিধানের দৃঢ়সংবদ্ধতা ও চিরন্তনতার স্বীকৃতি মেনে নিই। প্রকৃতপক্ষে, মহাবিশ্বের অভ্যন্তরস্থ গঠনের সমরূপ আদল সম্পর্কে ধারণা ব্যতীত বিজ্ঞান আদৌ অগ্রসর হতে পারেনি। মহাকর্ষের নিয়ম পৃথিবীর উপরিভাগ বা গভীর স্থান নির্বিশেষে সর্বত্র যে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে একই পদ্ধতিতে প্রযোজ্য। মজার বিষয় হলো: আধুনিক বিজ্ঞান তর্কাতীতভাবে তৌহিদবাদী প্রস্তাবনার ওপর নির্ভরশীল।

পল ডেভিসের মতো পদার্থবিজ্ঞানিগণ উল্লেখ করেছেন যে– মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়মবিধির একটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অকারণে মহাবিশ্বের নিয়মবিধির উদ্ভব হয়েছে– এটি ধারণা করা স্রেফ অযৌক্তিক– এবং অবৈজ্ঞানিক: মহাজগতের যৌক্তিক বোধগম্যতার সর্বাধিক পরিশুদ্ধ অভিব্যক্তি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলির মধ্যে, মৌলিক বিধিসমূহের মধ্যে পাওয়া যায়, যার জন্য বিশ্বপ্রকৃতি চালিত হয়। মহাকর্ষ এবং তড়িৎচৌম্বকীয় নিয়মসমূহ, সেসব নিয়ম যেগুলি

পরমাণুর মধ্যে থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং গতির নিয়মবিধি– সবই পরিপাটি গাণিতিক সম্পর্করূপে প্রকাশিত। কিন্তু এইসব নিয়মবিধি কোথা থেকে আসে? এবং তাদের যে আদল, তা কেন তেমনটি হয়েছে?... বছরের পর বছর আমি আমার চিকিৎসক সহকর্মীদেরকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেছি– পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি যেভাবে রয়েছে, তা কেন তেমন। এর জবাব 'ওটি কোনো বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন নয়' থেকে 'কেউ জানে না' পর্যন্ত ভিন্নতর হয়। পছন্দসই জবাবটি হলো: 'কোনোই কারণ নেই কেন তারা তেমন– তারা স্রেফ তেমনই।' নিয়মগুলি কোনো কারণ ছাড়াই বিদ্যমান– এই ধারণা একান্তভাবেই যুক্তিবিরোধী। সর্বোপরি, কিছু কিছু ঘটনার সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মূলকথা হলো: বিশ্বকে যৌক্তিকভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বস্তুগুলি যেমন, তেমনই আছে– এর কারণ রয়েছে। কেউ যদি এই কারণগুলিকে বাস্তবতার মূল ভিত্তিতে– পদার্থবিজ্ঞানের বিধি অনুযায়ী– কেবল সেই কারণটি খুঁজে বের করে, তবেই আমাদের প্রাপ্তি; এটি বিজ্ঞানের এক তামাশা।[৬৩]

বস্তুগুলি কেন বস্তুগুলির মতোই– তার ধারাবাহিক ব্যাখ্যাবলির অনুসন্ধান এক যুক্তিসিদ্ধ উপসংহারে নিয়ে যায় যে, মহাবিশ্বজগৎ পরিকল্পিত হয়েছিল জীবনের জন্য। বিজ্ঞানিগণ একে নিখুঁতভাবে সাযুজ্যপূর্ণ মহাবিশ্ব বা এই মানবীয় নীতি বলে উল্লেখ করেছেন যে– মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য এবং জীবনকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রকৃতির নিয়মগুলিকে এমন বিস্ময়করভাবে নির্ভুল পরিমাপে বিন্যাস করা হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানী ও দার্শনিক রবিন কলিন্সের মতে, ''যদি 'বিগ ব্যাং'-এর প্রাথমিক বিস্ফোরণটি ১০^{60}- এর এক ভাগের সামান্য অংশেও শক্তিতে হেরফের করত, তাহলে মহাবিশ্বজগৎ নিজের ওপরেই ভেঙে পড়ত অথবা নক্ষত্রমণ্ডলীর গঠনের জন্য খুব দ্রুতই সম্প্রসারিত হতো। উভয় ক্ষেত্রে জীবনের সূচনা অসম্ভব হতো।'' এটি ঘটার সম্ভাবনা ছিল বিশ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের এক ইঞ্চি পরিমাণ টার্গেটে গুলি করা এবং চিহ্নিত স্থানে আঘাত লাগানোর মতো।[৬৪]

কলিন্স মহাবিশ্বের গঠন-কাঠামোর মধ্যে নিখুঁতভাবে নির্মিত ছটি অনিবার্য ঘটনা পরীক্ষা করে এই চিন্তাধারাকে ব্যাখ্যা করেছেন: ১. মহাজাগতিক ধ্রুবক, ২. শক্তিশালী পারমাণবিক ও বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় শক্তি, ৩. তারকামণ্ডলীর মধ্যে কার্বন উৎপাদন, ৪. প্রোটন-নিউট্রন ভরের পার্থক্য, ৫. দুর্বল পারমাণবিক শক্তি, ৬. মাধ্যাকর্ষণ।[৬৫]

এসব শক্তি এবং ঘটনাগুলি এমন প্রক্রিয়ায় ভারসাম্যপূর্ণ যা সৃষ্টি করেছে এই বিস্ময়কর বিশ্বজগৎ– যেখানে আমরা বাস করি। জোরালো প্রমাণ ব্যতীত এটি কোনো যৌক্তিক বা যুক্তিসিদ্ধ অনুমান নয় যে– প্রতিটি অলৌকিক ঘটনাসহ এসব প্রাকৃতিক নিয়ম কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য ছাড়াই উপস্থিত হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক মহলে নিখুঁতভাবে সাজুয্যপূর্ণ এক মহাবিশ্বের ধারণা এর সমালোচক এবং সংশয়বাদীদেরও রয়েছে। সুতরাং, আস্তিক্যবাদের পক্ষে প্রকৃতিতে স্বয়ংদৃশ্যমান যে অজস্র প্রমাণ এবং বিশ্বাসযোগ্য, যৌক্তিক বিচার্য বিষয় রয়েছে তা বাস্তবিকই অস্বীকার করা যায় না। অ্যান্টনি ফ্লিউ দীর্ঘকাল ধরে নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক ছিলেন, যিনি পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল আস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেন; কিন্তু প্রকাশমান সুসামঞ্জস্যপূর্ণতা পরীক্ষা করে অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে– অবশ্যই মানবীয় অভিজ্ঞতার বাইরের কিছু প্রজ্ঞা জীবনের উদ্ভব এবং মহাবিশ্বের দুরধিগম্যতার জন্য দায়ী।[৬৬] তিনি লেখেন, আস্তিক্যবাদকে মনগড়া চিন্তা বা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। তাঁর ভাষায়: ''প্রাকৃতিক (ওহীর বিপরীত হিসেবে গণ্য) ধর্মতত্ত্ব নির্মাণ-প্রয়াসের প্রসঙ্গে এই নিখুঁত সামঞ্জস্যপূর্ণতা-বিতর্কের উপকারিতা-অপকারিতা যা-ই থাক না-কেন, এটি তাৎক্ষণিকভাবে অবশ্য স্বীকার্য যে, যারা বিশ্বাসী, তাদের জন্য তা যৌক্তিক– ভুলভাবে হোক কিংবা সঠিকভাবে– যে, প্রত্যাদিষ্ট বিখ্যাত তিনটি আস্তিক্যবাদী ধর্ম– ইহুদিধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম– এর যে কোনো একটির ধর্মীয় শিক্ষাকে গ্রহণ করার পক্ষে চমৎকার সাক্ষ্যপূর্ণ যুক্তি তাদের সামনে আগে থেকেই রয়েছে– নিখুঁত সামঞ্জস্যপূর্ণতার যুক্তিকে তাদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় বিশ্বাসের যথাযথ নিশ্চিতকরণ হিসেবে দেখতে।[৬৭] সম্ভবত প্রকৃত কুসংস্কার তথা ভিত্তিহীন গোঁড়ামি এই যে– মহাবিশ্ব একটি উদ্দেশ্যহীন দুর্ঘটনা।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, ''তারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন; আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে।' বস্তুত এই ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।''[৬৮] এই আয়াতের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত মুফাসসির আল-তাবারি বলেছেন, ''[আয়াতটির] অর্থ এই যে, তারা নিশ্চিতভাবে জ্ঞান রাখে না; যেমনভাবে তারা কেবল এরূপ অনুমান করে যে– আল্লাহর কাছ থেকে তাদের কাছে কোনো বার্তা আসেনি কিংবা তা যাচাইয়ের জন্য তাদের কাছে কোনো প্রতিপাদনযোগ্য প্রমাণও নেই।''[৬৯] অন্য কথায়, প্রমাণ ও যুক্তির ক্ষেত্রে জোরালো ভিত্তি ছাড়াই, আস্তিক্যবাদ-বিরোধীদের নিজেদের একটি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তাদের বেশিরভাগ দৌড়ঝাঁপ একটি আন্দোলন হিসেবে ভুলভাবে প্রতিনিধিত্বকারী

আস্তিক্যবাদী অবস্থানসমূহকে সম্পৃক্ত করছে ('কাকতাড়ুয়া' বিভ্রান্তি) [straw-man fallacy] অথবা কিছু স্বঘোষিত বিশ্বাসীর ('শাক দিয়ে মাছ ঢাকা' বিভ্রান্তি) [red herring fallacy] মনোযোগকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে বিকারগ্রস্ত আচরণের দিকে। বাস্তবে, এ বিষয়ে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রমাণ করা অসম্ভব যে– আল্লাহর অস্তিত্ব নেই। এমনকি ধর্মবিরোধী অন্যতম কট্টর নাস্তিক ও কঠোরতম সমালোচক রিচার্ড ডাউকিন্স স্বীকার করেছেন– তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন না যে আল্লাহ– এবং আরও বিস্তারিতভাবে বললে, আখিরাতের অস্তিত্ব নেই।[৭০]

এতদসত্ত্বেও, আস্তিক্যবাদের ওপর বিশ্বাস– অন্ততপক্ষে এক উচ্চতর শক্তি ও উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস– সব সময়ে আছে এবং চিরকাল থাকবে।

অদৃশ্য আল্লাহ

সবশেষে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের বিষয়ে একটি অভিন্ন আপত্তি হলো– আল্লাহকে সরাসরি দেখা যায় না বা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় না; তাহলে কেন যাকে দেখা যায় না, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব? এর উত্তর এই যে– সর্বশক্তিমান সর্বোচ্চ কুদরতি সত্তা, অনন্য এবং অপার্থিব আল্লাহর অবস্থান অদৃশ্যে (আল-গায়ব) মহাজাগতিক আবরণের বাইরে। যদিও আমরা আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাই না, তবুও পৃথিবীতে তাঁর পরিকল্পনা নৈপুণ্যের নিদর্শনাবলি দ্বারা আমরা যৌক্তিকভাবে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি।

আল্লাহকে দেখা যায় না, তাই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না– 'আল্লাহ নেই' মতের সমর্থক দার্শনিকদের এমন প্রচারণা বাস্তবে নতুন বা মৌলিক কিছু নয়। এমনটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ও বলা হতো। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, ''যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে, 'আমাদের নিকট ফিরিশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন?' তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করেছে গুরুতররূপে।''[৭১]

মক্কার মূর্তিপূজকদের বিতর্ক সৎ উদ্দেশ্য হিসেবে উত্থাপিত কোনো প্রশ্ন ছিল না; বরং তা ছিল ইসলাম গ্রহণ না করার স্রেফ একটা অজুহাত। কেউই যৌক্তিকভাবে দাবি করতে পারে না যে, কোনো কিছু দেখতে না-পারা তার অস্তিত্বহীনতা নিশ্চিত করে না। পৃথিবীতে এমন অনেককিছু আছে যেগুলো আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু সেগুলোতে আমরা বিশ্বাস করি; কারণ, আমরা তাদের অস্তিত্ব অনুমান করি তাদের চিহ্ন এবং প্রভাব থেকে। আমরা বাতাসকে দেখতে পাই না, কিন্তু আমরা তাকে দেখি ঘাস ও বৃক্ষরাজিকে আন্দোলিত করতে।

আমরা বেতার-তরঙ্গসমূহ দেখতে পাই না, কিন্তু আমরা তাদের সম্প্রচারের ফলাফল দেখতে পাই।

সংজ্ঞা অনুযায়ী, বিজ্ঞান সরাসরি এবং প্রচলিত উপায়ে– যেমন, পরীক্ষাগারে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে পারে না। বিজ্ঞান কেবল ভৌত, শরীরী বস্তুজগৎ– যাকে পরিমাপ করা যায় তার সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ এই বাস্তব পৃথিবীর বাইরে এবং পমিাপেরও বাইরে। যারা তাদের টেলিস্কোপসমূহ আকাশের বিভিন্ন জায়গায় তাক করেছিল এবং আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেছিল– যখন তারা মেঘের ওপর কোনো দাড়িওয়ালা লোককে বসে থাকতে দেখেনি, তখন ''আল্লাহর সত্যিকার পরিমাপ সম্পর্কে তাদের কোনো উপলব্ধি হয়নি।''[৭২]

বিজ্ঞানীদের দ্বারা গবেষণারত 'পেট্রি ডিশ' [গবেষণাগারে জীববিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যবহৃত অণুজীব পরীক্ষার অগভীর স্বচ্ছ প্লেটবিশেষ]-এ থাকা অণুজীবজগতের কথা এক মুহূর্তের জন্য বিবেচনা করুন। জীবগুলি এত ক্ষুদ্র যে, তাদেরকে পর্যবেক্ষণের জন্য বিজ্ঞানীদের অবশ্যই শক্তিশালী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। বিজ্ঞানীরা সেখানে আছেন, এটা উপলব্ধি করা কী সেই জীবদের পক্ষে সম্ভব? জীবদের পক্ষে কোনো অর্থবহ উপায়ে বিজ্ঞানীদের পরিমাপ করা কী সম্ভব? পরিমাপের নিখুঁত পার্থক্যটি জীবদের নাগালের বাইরে– এমন একটি বাস্তবতা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধির সক্ষমতা তাদের থাকে না।

আল্লাহর সাথে আমাদের যেমন সম্পর্ক, অনুরূপ সম্পর্ক বিজ্ঞানীদের দ্বারা গবেষণাকৃত জীবদের সাথে, তবে পার্থক্য এই যে– আমাদের সসীম অস্তিত্ব পরম সত্তার অসীমতার তুলনায় যদিও দুর্বল, তবুও আমরা আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন হতে পারি তাঁর নিদর্শনাবলির মাধ্যমে; তবে আমরা কখনোই আল্লাহর সম্পূর্ণ পরিমাপ বুঝতে পারি না। আল্লাহর বাস্তবতা সরাসরি অথবা যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। যদি মহাজাগতিক আবরণটি সরিয়ে নেওয়া হতো, তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর রুদ্ররূপ আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিত।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, ''তাঁর আবরণ হালকা। যদি তাঁর আবরণ সরিয়ে নেওয়া হতো, তবে যতদূর দৃষ্টি যায় তাঁর অপ্রসন্নতা ততদূর পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিত।''[৭৩]

সুতরাং, আল্লাহ মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলেন না; কথা বলেন নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে অবতীর্ণ ওহীর মাধ্যমে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, ''মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত ব্যতিরেকে– যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন; তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।''[৭৪]

উপসংহার

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রসঙ্গটি সোজাসাপ্টা– উপলব্ধি করা সহজ, এবং যুক্তি ও সুস্পষ্ট কারণ দ্বারা সমর্থিত। হৃদয় ও মনের মৌলিক অনুষঙ্গগুলি যখন আল্লাহর অস্তিত্বের সত্যতা এবং নবী-রাসূলগণের বার্তার মর্মবাণীর সাথে একাত্ম হয়, তখন বিশ্বাসে দৃঢ়তা অর্জিত হয়। আস্তিক্যবাদী হতে কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণ বা দর্শনের প্রয়োজন হয় না; প্রমাণ এবং যুক্তিগুলি সমস্ত মানুষের কাছে তাদের শিক্ষার স্তরনির্বিশেষে পৌঁছে যায়। এটি মহান স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও করুণার বহিঃপ্রকাশ– যিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন; যাতে আমরা তাঁকে জানতে পারি পরকালের বৃহত্তর জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সোপান হিসেবে। যাহোক, আধ্যাত্মিক পথটির লক্ষ্যে সত্যকে অনুসন্ধান করার জন্য, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ববিষয়ক প্রশ্নাবলির জবাব দেওয়ার জন্য এবং উদ্বেগজনক সংশয় দূর করার জন্য একটি স্থিতিশীল ও ধৈর্যশীল প্রচেষ্টা প্রয়োজন।... ঈমানদার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলোঃ অনুগ্রহ, করুণা এবং হৃদয়গ্রাহী প্রচার বা দাওয়াহ কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা, সবার জন্য সৎ ইচ্ছা ব্যক্ত করা এবং যাদের প্রয়োজন তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। সাফল্য আল্লাহর তরফ থেকে আসে, এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

[কিছুটা সংক্ষেপিত] (সমাপ্ত) ♦

তথ্যসূত্র

42. "Newton's Laws of Motion." National Aeronautics and Space Administration (NASA). Accessed 23 December 2016. www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/newton.html.

43. "Big Bang Cosmology." National Aeronautics and Space Administration (NASA). Accessed 23 December 2016. map.gsfc.nasa.gov/universe/bb_theory.html.

44. Leibniz, Gottfried W, Roger Ariew, and Daniel Garber. Philosophical Essays. (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1989), 149-150.

45. Overman, Dean L. A Case for the Existence of God. (Lanham, Md: Rowman & Littlefield, 2009), 40.

46. Hanby, Michael. No God, No Science?: Theology, Cosmology, Biology. (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013), 212.

47. Sūrat ʻĀle ʻImrān 3:190-191.

48. *Sacks, Jonathan. The Great Partnership: Science, Religion, and the Search for Meaning. (New York: Schocken Books, 2011), 1.*
49. *Ibn Abī Shaybah. Al-Muṣannaf. (Riyādh: Maktabat al-Rushd Nāshirūn, 2006), 5:266 #25942.*
50. *Sūrat al-Baqarah 2:164.*
51. *Sūrat al-Rūm 30:20-24.*
52. *Sūrat al-R'ad 13:4.*
53. *Sūrat al-Naḥl 16:12.*
54. *Sūrat Fuṣṣilat 41:53.*
55. *Ibn Taymiyyah, Majmū' al-Fatāwà, 1:48.*
56. *Ibn Kathīr. Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm, 106.*
57. *Ibid., 106-107.*
58. *Ibid., 107.*
59. *Ibid., 106.*
60. *Ibid., 107.*
61. *Ibid., 1:107.*
62. *Sūrat al-Anbiyā' 21:22.*
63. *Overman, A case for the existence of God, 42.*
64. *Murray, Michael J (ed.). Reason for the Hope Within. (Grand Rapids, Michigan: W.B. Eerdmans, 1999), 49.*
65. *Manson, Neil A. God and Design: The Teleological Argument and Modern Science. (London: Routledge, 2003), 179-190.*
66. *Wood, W J. God. (Durham: Acumen, 2011), 29.*
67. *Flew, Antony. God & Philosophy. (New York: Prometheus Books, 2005), 11.*
68. *Sūrat al-Jāthiyah 45:24.*
69. *al-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān, 22:80.*
70. *Bingham, John. "Richard Dawkins: I can't be sure God does not exist." The Telegraph. Accessed 23 December 2016. http://www.telegraph.co.uk/news/religion/9102740/Richard-Dawkins-I-cant-be-sure-God-does-not-exist.html.*
71. *Sūrat al-Furqān 25:21.*
72. *Sūrat al-Anām 6:91.*
73. *Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, 1:161 #179.*
74. *Sūrat al-Shūrā 42.*

পাকিস্তানের এই ভয়ানক কর্ম দমন করবে কে

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রকাশ, কানাডায় কারিমা বালুচ নামে এক বালুচ নারী কর্মী গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছেন। বিশ্বব্যাপী তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা গেছে। জীবনের হুমকির মুখে মিসেস বালুচকে পাকিস্তান ছেড়ে কানাডায় পালিয়ে যেতে হয়েছিল নিরাপত্তার জন্য। বালুচ মানুষের পক্ষে কথা বলার কারণে পাকিস্তানি সিক্রেট সার্ভিস ইনস্ট্রুমেন্টালিস্টরা তাকে হুমকি বলে বিবেচনা করে আসছিল। ফলে এটা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে পাকিস্তানি আন্ডারকভার এজেন্টরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এই সংবাদ সত্যিই খুব উদ্বেগজনক যে পাকিস্তানের এজেন্টরা তাদের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরের দেশে গুপ্ত হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ ঘটিয়ে যাচ্ছে। কারিমা বালুচই পাকিস্তানের ভূখণ্ডের বাইরে অবস্থানকারী একমাত্র খুনের শিকার নন, এর আগে ২০২০ সালের ২ মার্চ সাজিদ হাসান নামে একজন বালুচ সাংবাদিকও সুইডেন থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন এবং পরে তার মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল।

সাজিদ ২০১২ সালে পাকিস্তানের গোয়েন্দাদের হুমকির মুখে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন সুইডেনে। তিনি বেলুচিস্তানে পাকিস্তানি নৃশংসতার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে রোষানলে পড়েন। সেই থেকে সুইডেনে বসবাস করছিলেন সাজিদ। ২০১৭ রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার সুইডিশ অধ্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং বিশ্বাস করে যে তার অন্তর্ধান বেলুচিস্তানে পাকিস্তানি হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে তার রিপোর্টিংয়ের কারণেই তিনি খুন হয়েছেন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মনে করে, বেলুচিস্তানে পাকিস্তানি বর্বরতা চরম আকার ধারণ করেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রধান ব্র্যাড অ্যাডামস বলেছেন, পাকিস্তান সরকার এই ভয়াবহ নির্যাতনের অবসান ঘটাতে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। একটি বিশ্বস্ত সূত্রমতে, বেলুচিস্তানে খুন-নিখোঁজের মতো ঘটনা ঘটাতে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ইসলামিক জঙ্গিদের নিয়োগ করেছে। শুধু ২০২০ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ২৮টি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, যার ফলে ছিল ৩০ জন নিখোঁজ হওয়া এবং প্রায় ২৫ ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড, যাদের মধ্যে ছিলেন প্রদেশ বালুচ জাতীয় আন্দোলনের তথ্য সম্পাদক দিল মুরাদ বালুচ। পাকিস্তান সরকারের লোকেরা এসব চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি হিট স্কোয়াড গঠন করেছে। এই স্কোয়াড বেশ কয়েকটি বাড়ি লুটপাট ও ভাংচুর করেছে।

এসব নির্যাতন থেকে যারা ভাগ্যক্রমে বেঁচে এসেছেন, তাদের মধ্যে আছেন খলিল বালুচ। তিনি বালুচ জাতীয় আন্দোলনের চেয়ারম্যান। তিনি দাবি করেছেন, পাকিস্তান বেলুচিস্তানকে নির্যাতনের পীঠস্থানে পরিণত করেছে। অধিকন্তু বেলুচিস্তানে পাকিস্তানের বর্বরতা ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। নির্ভরযোগ্য তথ্যমতে, বেলুচিস্তানে সহিংসতা পাকিস্তান বাহিনী দ্বারা শুরু হয়েছিল, যা উদ্বেগজনক গতিতে প্রসারিত হচ্ছে। পাকিস্তানের হেলিকপ্টার ব্যবহার এই নির্যাতনকে আরো তীব্র করে তুলেছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, বালুচরা জাতিগতভাবে, ভাষাগতভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে পাকিস্তানিদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। তারা ১৯৪৮ সালে বেলুচিস্তানকে পাকিস্তানের সঙ্গে একীভূত করার সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর লন্ডন হয়ে দেশে ফেরার সময় বালুচ নেতারা তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং পাকিস্তানের বর্বরোচিত নির্যাতন থেকে তাদের মুক্তিলাভে সাহায্য চেয়েছিলেন।

বেলুচিস্তানে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির বসবাস হলেও বালুচ, ব্রমভি ও পশতুনরাই সংখ্যায় অধিক। দ্বাদশ শতাব্দীতে তারা সবাই মিলে একটি একক বালুচ পরিচয় তৈরি করেছিল। আকবরের শাসনামলে এটি মোগল শাসনের

আওতায় আনা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকেরা এই অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন, যদিও একজন ব্রিটিশ কমিশনার ছিলেন প্রশাসক। উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজের গ্রহণের প্রাক্কালে ক্লিমেন্ট অ্যাটলি অঞ্চলটির চারটি বিভাগ অর্থাৎ কালাট, মাকরান, লাস বেলা ও খরণকে বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিল– হয় ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িত হওয়া বা স্বাধীন থাকার বিষয়ে। একইভাবে বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল অন্যান্য প্রিন্স রাজ্যে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের উত্থানের আগে সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত পৌঁছেছিল। সেই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে কালাত স্বাধীন থাকবে। প্রকৃতপক্ষে জিন্নাহর পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থানের আগে ১৯৪৭ সালের আগস্টে ঘোষণা করেছিলেন যে, বেলুচিস্তান একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা করবে। কিন্তু বুদ্ধিমান জিন্নাহর মনে ছিল ভিন্ন চিন্তা। পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জনের পরে জিন্নাহ একটি প্রস্থান– কম মাউস ট্র্যাপ রচনা করেছিলেন।

যার ফলে কলাতের শাসক আহমেদ ইয়ার খান নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি এবং পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার ধ্বংসাত্মক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বড় ভাইয়ের এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ এবং অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তার ছোট ভাই প্রিন্স আবদুল করিম বেলুচিস্তানের মুক্তির জন্য আহমেদ ইয়ার খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। শুরুতেই সময়ক্ষেপণ না করে জিন্নাহ বালুচ স্বাধীনতাকে দমন করার জন্য তার বাহিনীও পাঠান।

যোদ্ধা যুবরাজ আবদুল করিম খান বিশাল লড়াইয়ে দমার মানুষ ছিলেন না এবং বালুচরাও তার পেছনে ছিল। ফলস্বরূপ তিনি আগুন জ্বালিয়েছিলেন, বালুচ মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধে চালিত করতে পেরেছিলেন। বেলুচিস্তানে নিষ্ঠুর নির্যাতন ও বর্বরতার জন্য মেজর জেনারেল টিক্কা খান 'বেলুচিস্তানের কসাই' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এই টিক্কা খানই বাংলাদেশে গণহত্যা শুরুর ভয়াবহ কাজটি করেছিলেন। কসাই টিক্কা খান আর নেই, কিন্তু বালুচদের নির্যাতন-নিপীড়নের জন্য তার পোষা অনুসারী পুডলগুলো রয়েছে। তারা তাদের উদ্ভট উদ্দেশ্যগুলো এবং চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। আলজাজিরা ওয়ার্ল্ড জানিয়েছে যে, পূর্ববর্তী বছরগুলোতে বেলুচিস্তানে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী নবাব আকবর খান বুগতি, যিনি বুগতি উপজাতির নেতাও, শহিদ হন ডিসেম্বর ২০০5 সালে। অপহৃত হওয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়।

রিয়াজ বালুচ একজন মানবাধিকার কর্মী, লন্ডনে বসবাসরত, রিপোর্ট করেছেন যে ৪০ হাজারেরও বেশি বালুচকে গত ১৮ বছরে অপহরণ করা হয়েছে এবং কয়েক হাজারকে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে বেলুচিস্তানের স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলোতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। বিবিসি পাকিস্তানের রিপোর্ট অনুযায়ী, ফেডারেল মানবাধিকার মন্ত্রক দ্বারা শেয়ার করা পরিসংখ্যান অনুসারে, ১ হাজার বালুচ মুক্তিযোদ্ধার মৃতদেহ বিগত পাঁচ বছরে সন্ধান পাওয়া গেছে। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র ডন জানিয়েছে, এর মধ্যে ৮০০ জনের বেশি লাশ বেলুচিস্তানে পাওয়া গেছে।

বেলুচিস্তান জ্বলছে

গত তিন বছরে ইন্টারন্যাশনাল ভয়েস অব বালুচ মিসিং পারসনের চেয়ারপারসন নসরুল্লা বালুচ দাবি করেছেন, ২০১৪ সালের মধ্যে ১৮ হাজার বালুচকে গুম করা হয়েছিল। ২০১৬ সালে পাকিস্তান ফেডারেল মানবাধিকার মন্ত্রক নিশ্চিত করেছে যে ২০১১ সাল থেকে কমপক্ষে ৩৬টি লাশ পাওয়া গেছে বালুচ নিখোঁজ ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর অনুসারে, ১ হাজার ২০০ ফেলে দেওয়া লাশ শনাক্ত করা হয়েছে, যা তা পায়নি বলপূর্বক অন্তর্ধানের কারণে লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। বলপূর্বক নিখোঁজ হওয়া, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের আকারে নৃশংস ঘটনাও ঘটে চলেছে। সিন্ধুতেও চলছে একই রকম হত্যাকাণ্ড। মূলত করাচিভিত্তিক ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি কর্তৃক। জি এম সৈয়দ নামে একজন সিন্ধু স্বাধীনতা নেতা তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হেফাজতে ছিলেন। এশিয়ান মানবাধিকার কমিশন বলেছে, সিন্ধুতে শতাধিক মানুষ অপহৃত হয়েছিল, যারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে।

এখনো অনেকে নিখোঁজ রয়েছে। ওয়ার্ল্ড সিন্ধু কংগ্রেসের সেক্রেটারি জেনারেল ২৫/৯/২০২০ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলকে বলেছেন, সিন্ধুতে জোর করে নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রয়েছে। আরো উল্লেখ করেছেন যে, গত ৩৬ মাসে ৬০ জনকে অপহরণ করা হয়েছে। তাদের অনেকেই চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (সিপিসি) প্রতিষ্ঠার বিরোধী।

চীনের ওয়ান বেল্ট এবং ওয়ান রোড প্রকল্পের শুরু থেকেই এর তীব্রতা দেখা দেয়। এই প্রকল্পের গধর বন্দর শহরটি রয়েছে বেলুচিস্তানে। চীনাদের পরিচালিত এই প্রকল্প বালুচ জনগণ তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা মনে করেন যে এই প্রকল্প পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বেলুচিস্তানের জনগণকে দমনমূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বালুচ জাতীয়তাবাদী চাইনিজ ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর হামলা চালিয়েছিল এবং করাচিতে চীনা কনস্যুলেটে আক্রমণ করেছিল। বেলুচিস্তান প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অন্যান্যসহ পাকিস্তানের সবচেয়ে সম্পদযুক্ত প্রদেশ। প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ রয়েছে। এদিকে পাকিস্তানে আহমদিয়ার বিরুদ্ধে নিপীড়ন কোনো নতুন ঘটনা নয়। এটি পাকিস্তানের শুরু থেকেই রয়েছে। পাকিস্তানের দুজন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত আহমদিয়া রয়েছেন। একজন স্যার মুহম্মদ জুফুরুল্লা খান, যিনি প্রথম এশিয়ান হিসেবে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক আবদুস সালাম।

কয়েক সপ্তাহ আগে মি. এমরান নামে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত একজন ব্রিটিশ সংসদ সদস্য অবহিত করেছিলেন যে বহু বছর ধরেই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে।

দুঃখজনকভাবে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানকে এসব অপকর্ম চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দিতে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তাদের উচিত পাকিস্তানকে সন্ত্রাস রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা। ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স (এফএটিএফ) দ্বারা পাকিস্তানকে গ্রে তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। যেসব দেশ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে মদদ দেয় এই সংগঠন তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে। তারা নিশ্চিত যে পাকিস্তান অব্যাহতভাবে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় ও তহবিল দিয়ে যাচ্ছে।♦

ইংরেজি থেকে অনূদিত

লেখক : বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

বিশ্ব আন্তঃধর্ম সম্প্রীতি সপ্তাহ

বিশ্বে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও আন্তঃধর্ম সম্প্রীতি সপ্তাহ

নাজীর আহ্মদ জীবন

ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত সারা বিশ্বে আন্তঃধর্ম সম্প্রীতি সপ্তাহ পালিত হবে। ২০১০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

এই যে তোমাদের জাতি–ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমার ইবাদত কর। কিন্তু তারা নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। (সূরা আম্বিয়া)

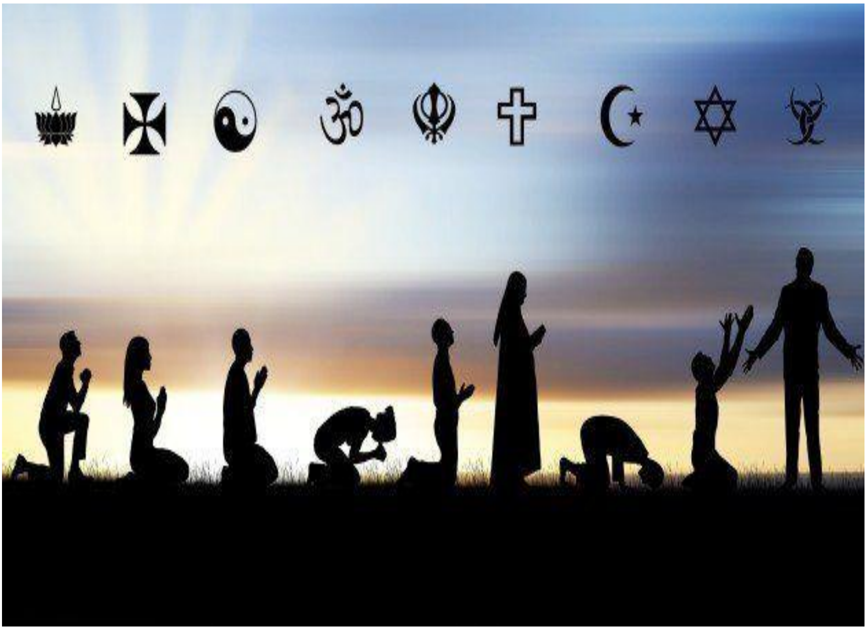

পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যা শান্তির কথা বলে না। এ দিক থেকে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ– ইসলাম অর্থই এক স্রষ্টায় আত্মসমর্পণ ও শান্তি। এটা অবধারিত যে, ধর্ম ও শান্তি একে অপরের পরিপূরক। যখন উদার চিত্তে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করে তখন শান্তি কোন অবস্থাতেই দূরে থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা রিপুর বশবর্তী হয়ে– অন্ধ বিশ্বাস ও ধর্মান্ধ হয়ে গোঁড়ামী করে ধর্মের এ শান্তির আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকি। এ বিশ্বাসঘাতকতার বিনাশ ও সংশোধন এর সময় এখন। কারণ বিশ্ব আজ সর্বকালের মধ্যে এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। পণ্য ও মানবতাকে আজ একমাপে ফেলা হচ্ছে। এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীকে ঘৃণার চোখে দেখছে। এ থেকে সরে আসার পথ আন্তঃধর্মীয় জ্ঞান, সংলাপ আর মানবতাবোধ ও ভালোবাসা।

এমন এক সময় ছিল যখন ধর্মগুলো নিজ নিজ গণ্ডিবদ্ধ আচার নিষ্ঠার কারণে পারস্পরিক সহযোগিতায় অক্ষম ছিল। অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধিতা মূলক মনোভাব পোষণ করত। কিন্তু সময়ের বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। যোগাযোগ

ব্যবস্থার বহু উন্নতির ফলে পৃথিবী ও সময় ছোট হয়ে এসেছে। ঐতিহাসিকভাবে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের একটা অংশ বিশ্ব শান্তির জন্য সকল মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অগ্রযাত্রা লক্ষ্যণীয়। কারণ তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন, ধর্মানুসারীদের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টি না হলে অধার্মিক ও ধর্ম বিরোধী শক্তি গোঁড়া ও ধর্মান্ধ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। ধর্মান্ধরা আরও বেশি করে শক্তিশালী হয়ে শান্তি সম্প্রীতিকে বিঘ্নিত করে পৃথিবীকে আরও সংকটের দিকে ফেলে দিবে এবং পরিণামে ভবিষ্যৎ মানব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ডকে পঙ্গু করে ছাড়বে। তাই যে কোন মূল্যেই হোক; মানব সমাজের গঠন কাঠামোর নৈতিক দিকটাকে রক্ষা করতে হবে। আর এ জন্য অত্যন্ত জরুরি– 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। কারণ আন্তঃধর্মীয় জ্ঞান, সংলাপ ও সমঝোতা ছাড়া আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি একান্তই অকল্পনীয়।

বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই ধর্মবিশ্বাসী। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত ধর্মবিশ্বাসীরা সংখ্যার দিক থেকে বেশি হলেও তারা বিভক্ত এবং নীরব। তাদের দীর্ঘদিনের বিরোধ আর নীরবতা মানব কল্যাণের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। তাই আর. ডি. অ্যাবারন্যাথী বলেন– 'আমাদের মধ্যকার বিভেদ; ভীরুতা এবং নীরবতা জাতিবাদ, দারিদ্র এবং যুদ্ধের পথকে প্রশ্নাতীতভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমাদের নীরবতার খেসারত দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। যাদের বন্ধু হিসেবে আমাদের কথা বলা উচিত ছিল।'

ধর্মানুসারীদের পরস্পরের প্রতি বিরোধিতাকেও এক সময় ধর্মের অঙ্গ হিসেবে মনে করা হতো। কিন্তু মানবজাতির উন্নতির জন্য শান্তির জন্য– সম্প্রীতির জন্য সে মনোভাবের পরিবর্তন করে পরস্পরের প্রতি সযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে হবে। তাই, লিক্যনিওয়ানো যথার্থই বলেছেন যে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মানুষের সুখ ও শান্তির নিমিত্তে ধর্মের সকল শাখাকে অভিন্ন লক্ষ্যের মাধ্যমে একত্রিত হতে হবে। আর. এ জন্য চাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সমঝোতা।

এ সংলাপ ও সমঝোতার কথা বেদ থেকে শুরু করে গ্রন্থ সাহেব পর্যন্ত সর্ব ধর্মগ্রন্থেই কম বেশি বলা হয়েছে। পরস্পরবিরোধী মতাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে ঋগ্‌বেদের নির্দেশ– সম্মিলিত হও; একত্রে বাক্যালাপে নিয়োজিত হও।....তোমাদের প্রার্থনা অভিন্ন হোক; এক হোক তোমাদের বাসনা ও উদ্দেশ্য এবং অভিন্ন হোক তোমাদের সাফল্য। তোমাদের অভিন্ন প্রার্থনার কথা পুনরাবৃত্তি করছি এবং অভিন্ন নৈবেদ্যের প্রস্তাব করছি। তোমাদের অভিপ্রায় অভিন্ন হোক,

অভিন্ন হোক তোমাদের হৃদয়; অভিন্ন হোক তোমাদের চিন্তা যার ফলে তোমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বাঙ্গীন ঐক্য।

সমকালীন পৃথিবীতে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত জাপান। এর অন্যতম প্রধান কারণ এ দেশের মূল ধর্ম– 'শিন্তোইজমের' উদার শিক্ষা। 'শিন্তোইজের' প্রাচীনতম গ্রন্থ দুটিঃ কো–জি–কি এবং নিহোঙ্গি। দ্বিতীয় গ্রন্থের শুরুতেই বলা হয়েছেঃ 'Harmony is to be valued, and an avoidance of wanton oppsition to be honoured;......when those above are friendly, and there is concard in the discussion of business, right view gain acceptance.'

এর অন্য একটি প্রধান ধর্ম গ্রন্থের শুরুতেই বলা হয়েছে– "সব মানুষ ভাই ভাই এবং সবাই একই স্বর্গের আশির্বাদপুষ্ট।"

বর্তমান বিশ্বে ইহুদিদের একটা অংশ সন্ত্রাস ও মুসলিম নিধনের সাথে জড়িত। অথচ তাদের নবী হযরত মূসা (আ) ঈশ্বরের কাছ থেকে যে দশটি নির্দেশ পেয়েছেন তার ছয় নম্বরটি হলো– 'কাউকে কোন অবস্থায় হত্যা করো না।' Old Testament বা পুরাতন নিয়মেও বর্ণিত আছে– ঈশ্বরের কাছে ছয়টি জিনিস অত্যন্ত ঘৃণার। এ ছয়টি হলো– ঔদ্ধত্যপূর্ণ দৃষ্টি; মিথ্যবাদীর জিহ্বা; এমন হাত যা নিষ্পাপের রক্ত ঝরায়; এমন অন্তর যা কুচিন্তানায় পূর্ণ; এমন পায়া দ্রুততার সাথে অশুভের দিকে আগায়, এমন মিথ্যুক সাক্ষী যার শ্বাস থেকে মিথ্যা বেরোয়; এবং সেই ব্যক্তিকে যে ভাইদের মধ্যে গোলমাল ঘটায়। ভাইয়ে ভাইয়ে একত্রে থাকা কত ভাল। চীন দেশের ইতিহাসে আন্তঃ ধর্মীয় সংঘাত খুব কম ঘটেছে। যেটুকু ঘটেছে তা ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে নয়, মূলত রাজনৈতিক কারণে। এক্ষেত্রে তাওইজম ও কনফুসিয়ানিজমের শিক্ষা প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে।

ইসলাম ধর্ম বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের মধ্যে সমন্বয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সম্মানের ভিত্তি স্থাপনে প্রয়াসী। এ ধর্ম বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের প্রতি ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে। কুরআনে বলা হয়েছে :

'নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যারা ইহুদি, সাইবেইন, ও খ্রিষ্টান, যে আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করে বস্তুত পক্ষে তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিত হবে না।' (৫ঃ৬৯) বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদেরকে সকলের বিশ্বাসযোগ্য একটি মৌলিক নীতিতে একত্রিত হবার জন্য আবেদন করে কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ 'তুমি বলো হে গ্রন্থানুসারিগণ,

আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে অভিন্নতা রয়েছে তার দিকে এসো– যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো উপাসনা না করি ও তাঁর কোনো অংশীদার স্থির না করি এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কাউকে প্রভুরূপে গ্রহণ না করি......(৩:৬৪) কুরআন এই শিক্ষা দেয় যে; আল্লাহ সব সময়ে সব দেশে সব যুগে সব জাতির জন্য প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন এবং মানব জাতির কোন অংশই এই স্বর্গীয় নির্দেশনা থেকে বহির্ভূত নয়। যেমনঃ তোমরা বল, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা– ইব্রাহিম; ইসমাঈল; ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালক থেকে যা প্রদত্ত হয়েছিল সে সসব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থান করছি; তাদের মধ্যে কাউকেই আমরা প্রভেদ করি না.........(২ঃ ১৩৬)

কুরআন দাবি করে যে, সকল মুসলমান অবশ্যই সকল প্রেরিত পুরুষের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বারা ব্যক্ত সত্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রত্যাদেশ সমূহে বিশ্বাস করবে। (৩৫ঃ ২৪)

মুসলমান অবশ্যই ভারত, চীন, পারস্য, আফ্রিকা, ইউরোপ সহ অন্য যে কোন দেশে জন্ম প্রাপ্ত সকল প্রেরিত পুরুষকে বিশ্বাস করবে। অবশ্য কুরআনে প্রেরিত পুরুষদের তালিকা বহির্ভূত কোন পুরুষকে নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে পারে না। তবে তিনি নিশ্চিতভাবে প্রেরিত পুরুষ হোন বা না-ই কোন অন্য ধর্মের মহাপুরুষদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে বিভেদ সৃষ্টি মুসলমানের কাম্য নয়। মূর্তিপূজা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত খারাপ কাজ। অথচ সে ইসলামই আবার অন্য ধর্মের উপাস্য বা দেব দেবীকে গালি দিতে বা নিন্দা করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যে সব উপাস্যকে ডাকে, তোমরা তাদের গালি দিও না।’ (সূরা আননাম ৬: ১০৮)

সম্প্রীতি যাতে নষ্ট না হয় এবং অন্যায়ভাবে একে যাতে অপরকে হত্যা না করে সে জন্য কুরআনে হুঁশিয়ারি বাণী হলো– যে একজন মানুষকে হত্যা করছে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করছে, যে একজন মানুষকে রক্ষা করছে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই রক্ষা করছে। (৫ঃ ৩৫)। রাইমুন্ড পানিকর বলেন– আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরস্পরকে জানা। এর উদ্দেশ্য অন্য ধর্মকে জয় করা নয়। অন্য ধর্মের সাথে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও এর উদ্দেশ্য নয়। এর আদর্শ হলো, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অজ্ঞানতাজনিত যে বিরোধ আছে তার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতিকে অনুধাবন করা। ফলে তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের

ভাষায় নিজস্ব সার বক্তব্যকে ব্যক্ত করতে পারবে। বস্তুত আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেককে তার নিজের কথা বলতে দেয়া এবং নিজস্ব উক্তির মাধ্যমে স্ব স্ব অন্তর্দৃষ্টি বা মর্মকথা প্রকাশ করতে দেয়া। তাই, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বা মতবিনিময় সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের সহায়ক শক্তি।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রকৃত কোন অবদান রাখতে চাইলে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক সংলাপ এ মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি। আমরা কে এবং কি তা জানার জন্য আমাদেরকে অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। অন্য ধর্মকে জানার একটি আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে আমাদের নিজেদেরকে জানা এবং আমাদের নিজেদেরকে জানার একটি আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানা। যে শুধু একটি মাত্র ধর্মকে জানে সে কোন ধর্মই সঠিকভাবে জানে না।" (ম্যাক্স মুলার)

আন্তঃধর্মীয় আলোচনায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও পূর্বশর্ত আছে। প্রথমেই স্মরণ রাখতে হবে, নিজেদের ধর্ম বা অন্যধর্ম সম্পর্কে কোন হঠকারী মন্তব্য না করা। বিভিন্ন ধর্মের ভিতরকার যে মিল ও অমিল আছে তা গুরুত্ব সহকারেই মেনে নিতে হবে। শুধু মিলগুলির উপরই জোর দিলে এক প্রকার শূন্য সর্বজনীনতার সৃষ্টি হবে। ফলে প্রতিটি ধর্মের স্বাতন্দ্র্য ও স্বকীয়তা বিঘ্নিত হবে। আবার শুধু অমিলগুলির উপর গুরুত্ব দিলে এক প্রকার সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার উদ্ভব ঘটবে।

পৃথিবীর ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজানো আবশ্যক। অর্থাৎ আমরা ধর্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দেই ব্যক্তিজীবনে সে রূপ অনুশীলন করা এবং যে রূপ অনুশীলন করি সে রূপই উপদেশ দেয়া কর্তব্য। কারণ, অন্ধ অন্ধের পরিচালক হতে পারে না। শুধু আমাদের ধর্মই সত্য এবং অন্য সব মিথা– এ ধরনের চিন্তাকে পরিহার করতে হবে। অন্য যে কোন ধর্ম সম্পর্কে যে কোন বিশুদ্ধ গবেষণাই এ সত্য প্রমাণিত করবে যে, সে ধর্মই আমাদের ধর্মের মতোই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। কাজেই সারা পৃথিবীতে শান্তির জন্য; আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির স্বার্থে সকল ধর্মের প্রতি সদ্ভাব পোষণ করা কর্তব্য। এন্থনী চিরাপন্নাথের মতে, যখন জীবন পরিচালনার নীতি হিসেবে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা হয় তখন বিভেদ ভিত্তিক দ্বন্দ্বগুলি পৃথিবী থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, একটি হীরকখণ্ড যেমন প্রতিটি কোণের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রকাশ করে, সত্য হচ্ছে তেমনি একটি বহুমুখী হিরকখণ্ড। আমরা আমাদের অজ্ঞানতার জন্যই সত্যকে খণ্ড খণ্ড হিসেবে দেখি এবং

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আচরণ করি। আমরা যদি সত্যিকার অর্থেই আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি চাই, তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা একটি বৃহৎ সত্তায় অন্তর্ভুক্ত একটি বিশাল পরিবারের সদস্য হিসাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছি এবং আমরা সকলেই ভালোবাসা ও সত্যের আত্মিক বাস্তবায়নের দিকে ধাবমান।

ইসলামী শরীয়তে কারও উপর বল প্রয়োগের বিধান নেই ধর্ম সম্পর্কে বল প্রয়োগের বিধান নেই, যেহেতু সুপথ, কুপথ হতে পৃথক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। (সূরা বাকারা রুকু–৩৪) আল্লাহ বলেন– তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মু'মিন হবার জন্য, মানুষের উপর যবর দস্তি করবে? (সূরাঃ ইউনুস রুকু–১০) তাই ইসলাম নীতিগতভাবেই ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রবক্তা। ধর্মীয় সহনশীলতা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। আর, ধর্মীয় সহনশীলতা ছেড়ে চাপ প্রয়োগ করে ধর্ম পরিবর্তন করা এক বড় ধরনের ফিত্না। 'ফিত্না হচ্ছে হত্যার চেয়েও মরাত্মক'। (সূরা বাকারা)

ইসলাম প্রচার করার জন্য বলা হয়েছে তবে এর পথ পন্থা সুন্দর ও উত্তম ভাবে। আল কুরআনে বলা হয়েছে– 'সুন্দর ও উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না (সূরা আনকাবুত) যারা ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের সঙ্গে

প্রত্যক্ষ শত্রুতামূলক আচরণ করে না, তাদের সঙ্গে সদাচারণ করা ইসলামের শিক্ষা। রাসূল (সা) বলেছেন– ‘সব সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর পরিবার। সুতরাং সৃষ্টি জগতের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় যে আল্লাহর পরিবারের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে।’ (বুখারী)

ইসলাম ধর্ম মতে সব মানুষ একই পিতা–মাতা থেকে সৃষ্টি এবং ভাই ভাই। কুরআনে বলা হয়েছেঃ ‘হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।’ (সূরা হুজরাত–১৩) পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হতে আল্লাহ বলছেন– “আর তোমার প্রতিপালক যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসত সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে ঈমান আনার জন্য?’ (সূরা ইউনুস– ৯৯)

অমুসলিমদের অধিকার খর্ব না করার জন্য মুহাম্মদ (সা) তাঁর অনুসারীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ ‘মনে রেখো যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোন বস্তু জোর পূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকদের পক্ষ নিব।’ (আবু দাউদ) আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রাসূল (সা) কর্তৃক প্রণিত ‘মদীনা সনদ’।

বাংলাদেশ মুসলমান প্রধান হলেও এ দেশে ইসলামী আদর্শ এবং মূল্যবোধ লালন ও চর্চার পাশাপাশি বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও পরধর্ম মত সহিষ্ণুতার বিষয়টিকেও গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ফলে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানসহ বাংলাদেশে বসবাসকারী আপামর জনসাধারণ সামাজিক সংহতি, পরমতসহিষ্ণুতা ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে। ধর্মীয় মত পার্থক্য সামাজিক অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।♦

সিলেটের গণভোট ও

মাওলানা সহূল উছমানী (র)

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে সিলেট সফরে এসে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেট সম্পর্কে লিখেছিলেন :

"মমতা বিহীন কালস্রোতে
বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রী ভূমি।"

এই পংক্তিমালায় বাংলা থেকে সিলেটকে বিচ্ছিন্ন করায় তিনি যে ব্যথিত হয়েছিলেন তাই বিধৃত হয়েছে। ১৮৭৪ সালে বৃটিশ শাসকরা এ জেলাটিকে ঢাকা বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। *(সিলেটের মাটি ও মানুষ, ফজলুর রহমান, পৃ. ১৬৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩)*

তার দীর্ঘ ৭৩ বছর পর সিলেটবাসী মুসলমানরা যখন প্রাণপণ লড়াই করে গণভোটের মাধ্যমে সিলেটকে পুনরায় বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত করে, তখন অনেকে একদিকে যেমন সিলেট বিভাগকে আসাম সীমানাতেই ধরে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, এ পুনর্মিলনে বাধা সৃষ্টির জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন, তেমনি তারাই পশ্চিমবঙ্গকে বাংলার মূল ভূখণ্ড বাংলাদেশ থেকে নানা কূটকৌশল প্রয়োগ করে বিচ্ছিন্ন করেছেন। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, ইতিহাসের কী নির্মম উদাহরণ! মাত্র বিয়াল্লিশ বছর পূর্বে ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগকে যারা বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ বলে অভিহিত করে সারা ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজকে নিয়ে একেবারে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন এবার তারাই আবার বঙ্গভঙ্গ করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলেন!

কী সৌভাগ্য সেই সব ভারতীয় আলেমদের যাঁরা নিজেরা উর্দুভাষী ও বিহারী এবং ভারতের যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের অধিবাসী হয়েও বাংলাদেশের মানচিত্রকে পূর্ণতা দানের সংগ্রামে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সংগ্রামে আলেমদের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা সহূল উছমানী ভাগলপুরী, মাওলানা যাফর আহমদ উছমানী, মওলানা রাগিব আহসান, মওলানা আজাদ সুবহানী ও পশ্চিমবঙ্গের ফুরফুরার পীর মওলানা আবুল হাসানাত আবদুল হাই (র) প্রমুখ। বাংলাদেশবাসীকে তাঁরা চিরঋণী করে গেছেন। আরেকটি কথা উল্লেখের দাবি রাখে, সিলেটের ঐ গণভোটযুদ্ধে কেবল আমাদের বাঙালি নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী, খাজা নাজিমুদ্দীন-শাহাবুদ্দীন ভ্রাতৃদ্বয়, মওলবী তমীযুদ্দীন খাঁ, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ও ছাত্রনেতা শাহ আযীযুর রহমান, সবুর খাঁ, ফজলুল কাদের চৌধুরী, শর্ষিনার পীর আবূজাফর মুহাম্মদ সালেহ ও মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী প্রমুখই নয়, পরবর্তীকালে জাতির পিতারূপে আত্মপ্রকাশকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর বন্ধু পরবর্তীতে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, ওলী আহমদ প্রমুখ তদানীন্তন ছাত্রনেতাগণও উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। পূর্বপাঞ্জাবের নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান (পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী), যুক্তপ্রদেশের চৌধুরী খালিকুয যামান (পূর্বপাকিস্তানের প্রথম গভর্নর), সীমান্ত প্রদেশের সরদার আবদুর রব নিশতার ও আসামের প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ সাদুল্লাহর মত সর্বভারতীয় জাঁদরেল মুসলিমলীগ নেতারাও এসে শামিল

হয়েছিলেন। মুসলিমলীগ সভাপতি কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অন্যতম ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী সিলেটের আবদুল মতিন চৌধুরী, আসাম প্রাদেশিক মুসলিমলীগের জেনারেল সেক্রেটারী দেওয়ান আবদুল বাসিত, মন্ত্রী মওলবী আবদুল হামিদ ও মনোয়ার আলী, মওলানা আবদুর রহমান সিংকাপনী, সিলেট জেলা মুসলিমলীগের সভাপতি মওলানা আবদুর রশিদ টুকেরবাজারী এবং মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ভার্থখলার হাজী মুনীরুদ্দীন চৌধুরী, মাওলানা আতহারআলী, মওলানা সখাওতুল আম্বিয়া (পরবর্তীতে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য) প্রমুখ সিলেটী নেতারা তো ছিলেনই। এ জাতি তাঁদের সকলের কাছেই চিরঋণী। বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে' অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বন্ধুবর দেওয়ান নূরুল আনোয়ার চৌধুরী লিখিত 'জালালাবাদের কথা' এবং তাঁর 'সিলেট বিভাগের ইতিহাসে' এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান তাঁর 'সিলেটের মাটি ও মানুষ' (পৃ. ১২৪) ও শতাব্দীর দর্পণ (পৃ. ২১-২৩) গ্রন্থদ্বয়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। এছাড়া নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ওসি, আবদুল ওয়াহিদ 'সিলেটের গণভোট' শিরোনামে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন।

এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও কর্মকাণ্ডের সাফল্যের প্রধান কৃতিত্বের অধিকারীরূপে মওলানা মুফতী সহূল উছমানী ভাগলপুরী (র)-এর গুরুত্ব সর্বাধিক। তাঁর জীবনী আলোচনায় আমরা এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পাবো।

আরেকটি কারণে মওলানা মুফতী সহূল (র)-এর অবদান তাঁকে বিশেষ গুরুত্বের আসনে আসীন করেছে। আর তা হলো, একটি ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য হচ্ছে, যে পাকিস্তান আন্দোলন পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সৃষ্টির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ গোটা ভারতবর্ষের মুসলিম সাধারণকে এমনি পাগলপারা করে তুলেছিল যে, যাদের প্রস্তাবিত পাকিস্তান সীমার মধ্যে পড়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না সে সব এলাকার মুসলমানগণও প্রস্তাবিত পাকিস্তান সৃষ্টির সংগ্রামে সর্বস্ব ত্যাগে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। শেখ মুজিবের অসমাপ্ত আত্মজীবনীর বহু স্থানে এ উপলব্ধির অভিব্যক্তি ঘটেছে যে, পাকিস্তান সৃষ্টি ছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের আত্মরক্ষার, অস্তিত্ব রক্ষার আর কোনই উপায় নেই। এক পর্যায়ে প্রায় দু শ'বছর ধরে আজাদী সংগ্রামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগকারী মুজাহিদদের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসা। ঐ মাদ্রাসার প্রাণপুরুষ শায়খুল হিন্দ্ মওলানা মাহমুদুল হাসানকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছিল। ভারতবর্ষে বসেই তিনি তুরস্কের তথা গোটা মুসলিম

জাহানের খলিফা ও আফগানিস্তান প্রভৃতি রাষ্ট্রের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। তাঁরই দূতরূপে মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী কাবুল হয়ে সুদূর সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' ও মাল্টাদ্বীপে বন্দিজীবন যাপন আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের দু'টি উজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁরই শিষ্যরা প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কাবুলে সর্বপ্রথম ভারতীয় প্রবাসী সরকার গঠন করেছিলেন। ১৯২০-২১ সালের যে খিলাফত আন্দোলন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক সাড়া জাগিয়েছিল তার প্রাণপুরুষও ছিলেন তিনিই। মওলানা মুহাম্মদ আলী-শওকত আলী ও মওলানা আবুল কালাম আজাদকে তিনিই এ আন্দোলনে উদ্দীপ্ত করেছিলেন– যাতে আমাদের মওলানা আকরম খাঁ ও মওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদীসহ অসংখ্য বাঙ্গালী আলেম উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই খিলাফত আন্দোলনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী ভারতীয় জাতির বাপুজী হতে সমর্থ্য হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে বাল-লাল-পাল (লালা লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক ও আমাদের সিলেটের বিপিনচন্দ্র পাল) ব্রাহ্মণ নেতৃত্রয়ের একক আধিপত্য ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে। গুজরাটি গান্ধীর কার্যত সেখানে প্রবেশাধিকারই ছিল না। উক্ত শায়খুল হিন্দু মাহমুদুল হাসানের মাল্টার বন্দি জীবনের ঘনিষ্ঠতম সহচর মওলানা হোসায়ন আহমদ মাদানী ও মুফতীয়ে আযম মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সহ তাঁর অধিকাংশ শিষ্যশাগরিদগণ ছিলেন অতি আত্মবিশ্বাসী। তাঁরা প্রায় সবাই জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পতাকাতলে সমবেত ছিলেন এবং তাঁরা পাকিস্তান আন্দোলনকে ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে ক্ষতিকর ও সর্বনাশা পরিকল্পনা বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের মতে, এটা দুর্বল ঈমানের অধিকারী আত্মবিশ্বাসহীনদের চিন্তাধারা। এটি ব্রিটিশ শাসকদের বহুল আচরিত ও কুখ্যাত ভেদনীতি 'Divide & Rule' এরই ফসল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিশাল হিন্দুসমাজ সংখ্যার দিক থেকে তাদের এক চতুর্থাংশ মুসলমানদের প্রতাপ ও শক্তির কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। মাওলানা মাদানীর ভাষায় : 'ত্রিশ কোটি তৃণভোজী ছাগল দশকোটি মাংসভোজী ব্যাঘ্রকে গ্রাস করে ফেলবে এরূপ ধারণা নেহাৎই অলীক।' বরং দেশ বিভাগের ফলে ভারতবর্ষের মুসলমানদের দীর্ঘ আট শ' বছরের শাসনামলে গড়া কৃষ্টিকালচার ও প্রতিষ্ঠানাদি ধ্বংস হবে। হিন্দুস্তান মুসলমানদের জন্যেও পাকিস্তান খোদ ইসলামের জন্যে খৎরা হয়ে দাঁড়াবে। মুসলিমলীগ নেতৃত্ব কোনদিনই পাকিস্তানে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করবে না। মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলতেন, ২৪ বছরের বেশিকাল পাকিস্তান টিকবে না। কেননা, বাঙালি জাতি একটি

সংগ্রামী জাতি। তারা দীর্ঘকাল বাইরের লোকদের শাসন বরদাশত করবে না। *(দেখুন ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম ও তার মৎকৃত অনুবাদ ও ভাষ্যগ্রন্থ 'ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিলো' নিউ বুক সোসাইটি বাংলাদেশ ঢাকা প্রকাশিত ১৯৭৪)*

এই যেখানে অবস্থা ছিল সেখানে মাওলানা মাদানীর সুদীর্ঘকালের চারণক্ষেত্র সিলেট বিভাগের মুসলমান ভোটারদের পাকিস্তানের স্বপক্ষে আনয়ন ছিল একটি সুকঠিন ব্যাপার। এটা কেবল দেওবন্দরই কোন স্বীকৃত ও ব্যক্তিত্বশীল প্রভাবশালী আলেমের পক্ষেই মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল। ব্যাপারটি কেবল সিলেট বা সীমান্ত প্রদেশের জন্যই নয় গোটা পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপারেই সমান সত্য ছিল। সৌভাগ্যক্রমে মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-কে (১৮৬১-১৯৪২) স্বপক্ষে পেয়েছিল– যাঁর সম্পর্কে জিন্নাহ সাহেব বলতেন, 'গোটা ভারতবর্ষের আলেম সমাজকে এক পাল্লায় এবং মাওলানা থানবীকে অন্য পাল্লায় রাখলে থানবী সাহেবের পাল্লাই ভারী হবে।' জিন্নাহর এ বক্তব্যটি অমূলক ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ– আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানী (১৮৮৭-১৯৪৯), আল্লামা যাফর আহমদ উছমানী (১৮৯১-১৯৭৪), আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (১৮৮৪-১৯৫৩), আল্লামা মুফতী সহূল উছমানী ভাগলপুরী (১৮৭৬-১৯৪৯), হাফিয মওলানা আতাহার আলী (১৮৯১-১৯৭১), মওলানা আবদুর রশীদ টুকেরবাজারী (১৮৯৬-১৯৮৭) প্রমুখ উলামায়ে কেরামের সকলেই ছিলেন হযরত থানবী (র)-এর শিষ্য-শাগরেদ ও খলিফা। এঁদের প্রাণান্তকর সংগ্রাম সাধনা ব্যতিরেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুসলিমলীগ-নেতৃত্ব এরই স্বীকৃতিস্বরূপ পাকিস্তানের প্রথম প্রভাতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ঐতিহাসিক শুভলগ্নে পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে প্রথমোক্ত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানীকে দিয়ে এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় আল্লামা যাফর আহমদ উছমানীকে দিয়ে এবং গণভোট বিজয়ী সিলেট জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ টুকেরবাজারীকে দিয়ে সিলেটে সর্বপ্রথম পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলনের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

মূল পাকিস্তান প্রস্তাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা বাংলাদেশ এবং গোটা আসাম প্রদেশ (যা বর্তমানে সাতটি রাজ্য হয়ে সপ্তকন্যারূপে বিখ্যাত) পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কেননা, সংখ্যার দিক থেকে এ গোটা ভূখণ্ডটি ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর মুসলিম লীগের দাবি ছিল ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলি (ভারতের দখলকৃত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যসহ) এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত

হবে– তীক্ষ্মদর্শী আইনজীবী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর শানিত যুক্তির কাছে মাথা নত করে বৃটিশ সরকার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ শেষ ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটন ও কংগ্রেসী হিন্দু নেতৃত্ব ষড়যন্ত্র করে মুসলিম প্রধান পশ্চিমপাঞ্জাব থেকে পূর্বপাঞ্জাবকে (মুসলিম প্রধান গুরুদাসপুর জেলা সহ) এবং বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে সমর্থ হয়। আসামে লীগ রাজনীতির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও (স্যার সাদুল্লাহ ছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী) গান্ধী প্যাটেলের ধমকে কংগ্রেসী হিন্দু নেতারা প্রদেশটিকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার আন্দোলন করতে বাধ্য হন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমান খায়বার পাখতুনখা) মুসলিম প্রধান হওয়া সত্বেও সীমান্তগান্ধী বলে পরিচিত আবদুল গাফফার খানের কংগ্রেসী রাজনীতির প্রভাবে গণভোট করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ওদিকে হিন্দুপ্রধান পূর্বপাঞ্জাবের মুসলিমপ্রধান গুরুদাসপুর জেলায় গণভোটের দাবি স্বীকৃত না হলেও আসামের সিলেট জেলায় গণভোট দাবি স্বীকৃত হয় এবং সে মতে ১৯৪৬ সালের ৭ ও ৮ জুলাই তারিখে গোটা সিলেট জেলাব্যাপী (বর্তমানে বিভাগ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। বৃহত্তর সিলেট জেলা তথা বর্তমান সিলেট বিভাগে মুসলিম প্রাধান্য ছিল অনেকটা মার্জিন্যাল। অনুপাতে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৪৬:৫৪। আবার মাওলানা মাদানীর দীর্ঘকালের চারণক্ষেত্র হওয়ায় মুসলিম হওয়া সত্বেও জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ ছিল কংগ্রেস তথা অবিভক্ত ভারতের পক্ষপাতী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সমর্থক। করিমগঞ্জ বদরপুরের প্রভাবশালী পীর মাওলানা ইয়াকুব উরফে হাতেমআলী পীরসাহেব, মোগলাবাজারের মাওলানা আবদুল জলীল (পরবর্তীতে আসামে হিজরতকারী এবং আসাম রাজ্যসভার প্রায় আজীবন সদস্য) জৈন্তার মাওলানা ইব্রাহীম চতুলী (আসাম রাজ্যসভার সদস্য) প্রমুখ অনেক জাঁদরেল প্রভাবশালী আলেম ঐ গোষ্ঠীতে সক্রিয় ছিলেন। ফলে সিলেট জেলার গণভোটে পাকিস্তানভুক্তির সম্ভাবনাটা ছিল ক্ষীণ। এ সময় গোটা ভারতবর্ষের মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সহায়তায় যদি খোদ দেওবন্দেরই কিছু প্রভাবশালী আলেম এগিয়ে না আসতেন তাহলে এ গণভোটে মুসলিম লীগ পন্থীদের বিজয় লাভ এবং পাকিস্তানভুক্তি ছিল একটি অসম্ভব ব্যাপার। কেননা ধর্মীয় আচার-আচরণে মুসলিমলীগপন্থীদের ঘাটতিটা ছিল সুবিদিত।

এমতাবস্থায় মুসলিম ধর্মপ্রাণ জনগণের পক্ষে তাদের প্রতি আস্থাশীল হওয়াটা ছিল একটি কঠিন ব্যাপার। এটি পাকিস্তান অর্জনের পথে সর্বত্রই একটি বাস্তব প্রতিবন্ধক ছিল– যা গণজোয়ার সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম লীগ মোকাবেলা করতে পেরেছিল।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সৌভাগ্যক্রমে মুসলিম লীগ হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-কে তার সমর্থকরূপে পেয়ে গিয়েছিল যিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় উগ্র সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী হিন্দুদের উপর ভরসা করে অবিভক্ত ভারত গড়ার পরিবর্তে মুসলমানদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী ও সচেষ্ট হওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। মুসলিম লীগের নেতাদের মত তাঁর মনেও গভীর অবিশ্বাস ছিল যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দোহাই দিয়ে অবিভক্ত ভারতীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি সুবিচার করবে না। আর একটি অমুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নও কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। তাই তিনি তানযীমুল মুসলিমীন নামে একটি ফতোয়া রচনা করে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে জোরদার বক্তব্য দিয়েছিলেন। ঐ রচনাটি আসলে ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক দিকদর্শন প্রদানকারী রচনা। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুসলিমলীগ নেতারা দীর্ঘকাল কংগ্রেসী রাজনীতি করার পর বাস্তবক্ষেত্রে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, খানকাবাসী বিজ্ঞ আলেম মাওলানা থানবী (র) তাঁর খোদাপ্রদত্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে তা অনুধাবন করলেন এবং তার স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপিত করলেন। ফলে ভারতবর্ষের বৃহত্তর আলেম সমাজ ও তাদের সংগঠন জামিয়তুল উলামায়ে হিন্দ্ এর যুক্তিপ্রমাণ ও অবিভক্ত ভারতের স্বপক্ষের আহ্বান বৃহত্তর মুসলিম সমাজের কাছে তার প্রভাব হারিয়ে বসে।

কিন্তু একটি বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করা যায় না। মাওলানা হোসায়ন আহমদ মাদানীর জ্ঞানবত্তা, তাসাউফ সাধনা এবং চারিত্রিক মহানুভবতার গভীর প্রভাব পড়েছিল সিলেট বিভাগের মুসলিম সমাজে। এ অঞ্চলে তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। তাঁর কয়েক ডজন খলিফা কেবল সিলেট জেলায়ই রয়েছেন– যাঁদের অনেকেই বরেণ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং বিশিষ্ট আলেম। ফলে তাঁদের প্রভাব সিলেটের গণভোটে মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তানপন্থীদের পথে ছিল বিরাট প্রতিবন্ধক। মাওলানা আতহার আলীর মত একজন বরেণ্য আলেম হযরত থানবীর খলীফা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর মুর্শিদের আদেশে জেলার বাইরে কিশোরগঞ্জকে তার কর্মস্থলরূপে বেছে নিয়েছিলেন। তাই মাওলানা মাদানীর মোকাবেলায় সিলেটে তাঁর প্রভাব তেমন কার্যকরী ছিল না। সিলেটের মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এ অভাবটি হাড়ে হাড়ে অনুভব করছিলেন। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতেই তাঁদের বিশিষ্ট কয়েকজন নেতা আসামের চারজন মন্ত্রী পাঠানটোলার মওলবী আবদুল হামিদ, ভাদেশ্বরের আবদুল মতিন চৌধুরী, সুনামগঞ্জের

মুনাওয়ার আলী ও মোদাব্বির আহমদ সিলেট শহরের উপকণ্ঠে টুকের বাজারে অবস্থিত মওলানা আবদুর রশীদ মরহুমের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে তাঁর মুর্শিদ মাওলানা থানবীর ফতোয়ার দোহাই দিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানালেন। মওলানা আবদুর রশীদ পাঠ্যাবস্থায় দেওবন্দ গেলে থানাভবনে গিয়ে হযরত থানবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ বার বছর পর্যন্ত নির্জন খানকাহ জীবন অতিবাহিত করছিলেন। বাইরের জগতের সাথে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। মুসলিম লীগ নেতারা তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে উত্তর সিলেট জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি পদ গ্রহণে সম্মত করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তর সিলেট (বর্তমান সিলেট জেলা) তখন সিলেট জেলার চারটি মহকুমার একটি ছিল, জেলা ছিল না। কিন্তু নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ঐ দুটি এলাকার বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় কোলকাতা মহানগরী মুসলিম লীগ এবং উত্তর সিলেট মহকুমা মুসলিম লীগকে একটি পূর্ণ জেলা মুসলিমলীগের মর্যাদা দানের বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সে মতে মাওলানা আবদুর রশীদ সিলেট জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি হলেন। এ তথ্যটি আমি আমার চাচা উক্ত মাওলানা আবদুর রশীদ সাহেবের মুখেই শুনেছিলাম।

১৯৪৬ সালে যখন গণভোটের মাধ্যমে সিলেটের ভাগ্য নির্ধারণের সরকারী সিদ্ধান্ত বৃটিশ সরকার ঘোষণা করলো তখন এ গণভোটের দায়িত্বটি মুসলিম লীগের নেতাদের উপরই বর্তিয়েছিল। দেওবন্দ দারুল উলুমের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে মওলানা আবদুর রশীদের উক্ত দারুল উলুমের প্রধান মুহাদ্দিছ ও শিক্ষা সচিব মাওলানা মাদানীর বিপক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ ছিল একটি সুকঠিন ব্যাপার। অথচ এই গণভোটের বিজয় অর্জন ছাড়া সিলেটের পাকিস্তানভুক্তি কোনরূপেই সম্ভব ছিল না। অথচ মুসলিম লীগের সাংগঠনিক প্রধান (সভাপতি) হিসাবে তার দায়ভাগই ছিল সর্বাধিক। এ গণভোট বিজয়ের জন্যে তিনি যে দুটি মোক্ষম কৌশল গ্রহণ করেন সে দুটি হলো :

(১) মাওলানা সহূল উছমানীর নেতৃত্বে আলেম সমাজকে সক্রিয় করণ

(২) সিলেট বিভাগের সুসংগঠিত মুসলিম মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে স্বপক্ষে সক্রিয়করণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় ও পার্বত্য ত্রিপুরার পাহাড়-পর্বত নিঃসৃত জলরাশির দ্বারা সৃষ্ট হাওর বাওরসমৃদ্ধ সিলেট বিভাগে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ভোটের ব্যাপারে একটি বড় ফ্যাক্টর।

আমাদের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত তাঁর আত্মজীবনীতে তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতি শীর্ষক দীর্ঘ কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী (পৃ. ৪২-৬১) প্রবন্ধে সিলেটের গণভোট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন :

'গণভোটের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন বিদ্বেষী কর্মকর্তা লীগেল সিনিয়র স্টাফ এবং সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বে আছেন শিখ অফিসার লে. কর্নেল মহিন্দর সিং। সরকারী সমর্থন ছাড়াও কংগ্রেসের আছে অর্থবল। মুসলমানদের মধ্যে আছেন কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে উলামায়ে হিসাবে তাদের বিখ্যাত নেতা হোসেন আহমদ মাদানী কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে তৎপর। মওলানা মাদানীর গোঁড়া শিষ্যরা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করলো। তারা স্লোগান তুললো, ঘরের ছেলে ঘরে থাকো, ঘরের বাক্সে ভোট দাও।' (উল্লেখ্য, গণভোটকালে কংগ্রেসের ভোটের মার্কা ছিল ঘর) মওলানা সহূল উছমানী ছিলেন আরেক প্রভাবশালী ধর্মনেতা। তিনি সিলেট আলিয়া মাদ্রাসায় অনেকদিন ছিলেন এবং তাঁর অনুসারীও ছিল প্রচুর। তিনি তখন বিহারে এবং বয়সে প্রায় অশীতিপর। তাঁকে অনুরোধ করে নিয়ে আসা হলো এবং তিনি ফতোয়া দিলেন যে কুড়ালের (মুসলিম লীগ প্রতীক) জন্য ভোট দান বায়তুল ইসলামের জন্য ভোট। তিনি তার বয়সের বিবেচনা না করে জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়ালেন।" (পৃ. ৫৫-৫৭)

১৯৪৬ সালের ৬ ও ৭ই জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ গণভোট মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তান পক্ষ ৫৬,০০০ ভোটে জয়যুক্ত হয়ে সিলেটের পাকিস্তানভুক্তির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। যে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করণে অনেক ফাঁক ফোকড় ও ছল-চাতুরী ছিল।

এ গণভোট যেমন সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের প্রায় সবাই সিলেটে এসেছিলেন তেমনি একজন কর্মী হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বিশাল কার্যবাহিনীসহ বেশ কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষা সচিব উপরন্তু জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রধান মাওলানা হোসায়ন আহমদ মাদানীর বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিশেষত তাঁর আধ্যাত্মিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্র সিলেটে ছিল ব্যাপক। গোটা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা শিষ্য-সাগরেদগণ রমযান মাসে সিলেটে এসে তাঁর সাথে এত্তেকাফ করে তাঁর খিলাফত তথা আধ্যাত্মিক পূর্ণতার সনদ হাসিল করতেন। এমতাবস্থায় তাঁর শিষ্য পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব সিলেট মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদের পক্ষে তার মোকাবেলা করা ছিল একটা অসম্ভব ব্যাপার। অন্য কেউ বুঝুক বা নাই বুঝুক নিজে তিনি তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন যে মুসলিম লীগের সভাপতিরূপে এ গুরু দায়িত্বটি পালনের দায়িত্বটি

তাঁরই উপর সর্বাধিক বর্তায়।। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, মাওলানা মাদানীর মোকাবেলা করতে হলে তার বিপক্ষে মুসলিম লীগের স্বপক্ষে একজন প্রবীণ আলেমের বিশেষত দেওবন্দী মহলে স্বীকৃত কোন বিশাল ব্যক্তিত্বের সমর্থন ও সহযোগিতা অপরিহার্য। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তেমনি একজন ব্যক্তিত্বের সন্ধানও দিলেন তাঁর সহকর্মী মুসলিম লীগ নেতাদেরকে। তিনি ছিলেন দেওবন্দ দারুল উলুমেরই সাবেক মুফতীয়ে আযম মাওলানা সহূল উছমানী ভাগলপুরী (র)। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ছিলেন মাওলানা মাদানীর চাইতেও বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তিনিও মাদানী সাহেব যে উস্তাদের গদীনশীন ও প্রতিনিধিরূপে দেশব্যাপী খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিলেন সেই শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)-এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন শিষ্য এবং ততোধিক খ্যাতিমান ও স্বীকৃত আলেম মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গোহী (র)-এর খলিফা। তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ্যে হযরত মাদানীর মত না হলেও আলেম সমাজের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতি কোন অংশেই কম ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে তিনিও সিলেটের জনজীবনে একজন পরিচিত ও স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৯১৮ সালে প্রথমবার তিনি সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকরূপে সিলেট এসেছিলেন। তখন স্বল্পকাল তাঁর সিলেট অবস্থানের পরই তাঁর মাতৃভূমি পাটনার বিস্তৃত শামসুল হুদা মাদ্রাসায় প্রিন্সিপালরূপে তাঁর ডাক পড়ে এবং তিনি দীর্ঘকাল সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে সিলেট মাদ্রাসায় টাইটেল ও হাদীস ক্লাস চালু হলে প্রধান মুহাদ্দিসরূপে তাঁরই ডাক পড়ে। কেননা, গোটা ভারতবর্ষে সরকারী মাদ্রাসা হিসাবে এ মাদ্রাসাটি ছিল ১৭৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসারই সমপর্যায়ের। তাই আসাম সরকার গোটা ভারতবর্ষের খ্যাতিমান কোন আলেমকে দিয়েই সিলেট আলিয়া মাদ্রাসার হাদীস ক্লাস শুরু করতে আগ্রহী ছিল। তাঁর এই এই সর্বভারতীয় খ্যাতির জন্যেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের স্বপক্ষে ১৯৪৫ সালে কোলকাতায় জমিয়তুল উলামায়ে হিন্দের মোকাবেলায় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সর্বভারতীয় আয়োজন করেন তখন এই মাওলানা সহূল উছমানীকেই তাঁরা সংগঠনটির সভাপতিরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। কিন্তু বয়সের ভারে ন্যুব্জ মাওলানা মুফতী সহূল উছমানী সে গুরুদায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিতে অপারগতা জ্ঞাপন করেন। অগত্যা তার বিকল্পরূপে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানীকে সে সংগঠনের সভাপতিরূপে তাঁরা মনোনীত করেন– যিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠতায় তাঁর দ্বিতীয় স্থানীয়।

সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত প্রধান মুহাদ্দিসরূপে কর্মরত থাকার পর তাঁর কর্মকাল সমাপ্তির পরও আসাম সরকার বর্ধিত মেয়াদে

সেই পদে থাকার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বয়সের ভারে ন্যুব্জ মাওলানা উছমানী ১৯৪৪ সালের ১লা মে তারিখ সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ভাগলপুরের পৈত্রিক নিবাসে চলে যান।

সিলেট বিভাগের জনজীবনে মাওলানা সহূল উছমানীর যে কী বিপুল প্রভাব ছিল তার প্রমাণ হচ্ছে ১৯১৯ সালে আওরঙ্গপুরের জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় সৈয়দ আফরোজ হাসান মজুমদার ও সৈয়দ ইয়াওর হাসান মজুমদারের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের খসরুপুর মাঠে অনুষ্ঠিত উলামা সম্মেলনে তিনিই সভাপতিত্ব করেছিলেন। সে সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন কোলকাতা থেকে আগত বাগ্মী বক্তা সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন শিরাজী। ঐ সম্মেলনেই সর্বপ্রথম আসাম প্রাদেশিক উলামা সমিতি গঠিত হয়েছিল। মওলানা আবদুল হক চৌধুরী মুখতারপুরী, মওলানা সাখাওতুল আম্বিয়া বফীপুরী, মওলানা নযীরুদ্দীন বালিকান্দী, ডাক্তার মর্তুজা চৌধুরী গাভুরটেকী ও মাওলানা আবদুর রহমান সিংকাপনী প্রমুখ এ সম্মেলনে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সিলেট বিভাগে এটি ছিল অভূতপূর্ব সফল সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনের ভাষণে তাঁরই প্রস্তাবে সিলেটের নয়া-সড়কে ঐতিহাসিক খিলাফত বিল্ডিং-এ একটি কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়– যা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত বেদখল থাকার পর শায়খে-কাতিয়া মরহূম মওলানা আমীনুদ্দীন কর্তৃক পুনরায় চালু হয়ে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। মওলানা মাদানী (র) এ মাদ্রাসায় দীর্ঘকাল হাদীসের দারস দিয়েছেন।

১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নিখিল ভারত জমিয়তুল উলামায়ে হিন্দেরও মহাসচিব দিল্লীর মাওলানা আহমদ সাঈদের সভাপতিত্বে আসাম প্রাদেশিক জমিয়তে উলামার ৪র্থ সম্মেলনে মাওলানা সহূল উছমানী পাটনা থেকে এসে শরীক হয়েছিলেন। তিনিই যে জমিয়তে উলামায়ে আসাম প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ তা কোনক্রমেই ভুলতে পারেননি এবং তিনিও তাতে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেননি। সিলেট বিভাগের সর্বত্র তাঁর সাগরেদ ও খলিফাগণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন।

১৯৪৭ সালের গণভোট কালের সংকটে তাঁকে পাশে পাওয়া যে কত জরুরী ছিল তা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি। সংগঠন হিসাবে মুসলিম লীগই ছিল এ প্রয়োজন পূরণের সবচাইতে বড় দায়িত্বশীল এবং তাদের গরজই ছিল সর্বাধিক। কিন্তু জীবনের অন্তিম পর্যায়ে মাওলানা সহূল উছমানী (র) একাকী সিলেটে আসতে কোন মতেই রাজি হচ্ছিলেন না। বিশেষত ঐ সময়ে বিহারে প্রচণ্ড মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা হচ্ছিল। সিলেটে তাঁর পাকিস্তানের স্বপক্ষে তৎপরতার সংবাদে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি তাঁর পরিবার-পরিজনের সর্বাধিক ক্ষতি করবে,

এমনকি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়াও বিচিত্র নয়। অথচ গোটা পরিবারকে এতদূর থেকে সিলেট স্থানান্তরিত করাটা ছিল বেশ ব্যয় সাপেক্ষ। তাঁকে সিলেটে নিয়ে আসা অপরিহার্য বলে সকলে একমত হলেও বিশাল ব্যয়ভার বহনে মুসলিম লীগের দায়িত্বশীল জমিদার শ্রেণীর লোকজন ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। মাওলানা সাহেবকে পাটনা থেকে নিয়ে আসার দায়িত্বশীল এবং তাঁরই একান্ত খাদেম মাওলানা সৈয়দ তাফাজ্জল হোসায়ন এ ব্যাপারে সিলেটের ব্যবসায়ী মহলের কয়েকজনের দানের কথা উল্লেখ করেছেন বটে; কিন্তু মুসলিম লীগ নেতৃত্বের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তো তাঁর জানার কথা নয়। সৈয়দ নবাব আলী ও প্রিন্সিপাল মজদুদ্দীন সাহেবের পরম আগ্রহ ও তাদের অবদানের কথাও তাঁর জানামতে তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভিতরের খবর তো তাঁর জানা ছিল না! তাই সেই অকথিত কথাটি আমাকে এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে। আমার তথ্যসূত্র খুবই প্রামাণ্য, কেননা সিলেট মুসলিম লীগের তদানন্তীন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আমাকে এ তথ্য দিয়েছেন। সিলেট বিশেষত গবেষক বন্ধুবর দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসায়ন চৌধুরীর সিলেটের গণভোট গ্রন্থে এবং মাওলানা সহূল উছমানীর খলিফা ও জীবনী লেখক মাওলানা সৈয়দ তাফাজ্জল হোসায়নের গ্রন্থেও সেদিকে ইংগিত রয়েছে।

সিলেট মুসলিম লীগের তদানীন্তন সভাপতি মাওলানা আবদুর রশীদ মরহুম ছিলেন আমার চাচাতো দাদার ভাতিজা। বাংলাদেশ হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি ও নির্বাচন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান মাসঊদ চৌধুরী আমাকে বলেছেন, 'আমরা ছিলাম মুসলিম লীগের ছাত্র ও যুবকর্মীরূপে মাওলানা আবদুর রশীদ সাহেবের যুবকর্মী। অনেক সময় তাঁর পক্ষ থেকে পত্রিকায় বিবৃতির মুসাবিদা লেখার কাজটি তিনি আমাকে দিয়ে করাতেন।' আবদুস সামাদ (পরবর্তীতে আজাদ), এডভোকেট জসীমুদ্দীন, পরবর্তীতে প্রায় আজীবন সিলেট জেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি), সাবেক প্রধান বিচারপতি মাহমুদ হোসেন, দেওয়ান ফরিদ গাজী, ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান, আবুল মাল আবদুল মুহিত প্রমুখও ছিলেন এই কাতারেই। সিলেটের গণভোটের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, ফজলুল কাদের চৌধুরী প্রমুখও ছাত্রকর্মীরূপে সিলেটে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গণভোট উপলক্ষে গোটা ভারতবর্ষের মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে স্পিকার তমীযুদ্দীন খানও সিলেটে গিয়েছিলেন এবং তিনি শহরের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশের চাইতে মাওলানা আবদুর রশীদের টুকের বাজারের বাড়িতে গিয়ে রাত্রি যাপনকেই আরামদায়ক বিবেচনা করতেন। ঐ সময় তিনি বেশ কয়েকদিন আমাদের বাড়িতেই ছিলেন।

সত্যিকথা বলতে কী মাওলানা আবদুর রশিদের ঐ বিশাল কর্মযজ্ঞের দিনগুলোতে আমি ছিলাম ছোট একটি শিশুমাত্র। জিন্নাহ সাহেবের ইন্তেকালের দিন (১৯৪৮ সালে) মন্ত্রী আবদুল হামিদ সাহেবকে তার সাথে দেখা করতে যেতে দেখেছি, স্মরণ আছে।

মাওলানা আবদুর রশিদের জীবনের অন্তিম পর্যায়ে বিগত শতকের আশির দশকে একদিন আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন :

'হযরত মাওলানা সহূল উছমানীকে সিলেটে আনা গণভোটের জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিল। এর গুরুত্ব মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সকলেই বুঝতেন এবং স্বীকারও করতেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁর পরিবারবর্গকে অরক্ষিত অবস্থায় বিহারে রেখে ছেড়ে একা সিলেটে আসতে কোনমতেই রাজি হলেন না, তখন বিরাট খরচের কথা ভেবে সকলেই পিছিয়ে গেলেন। তখন আমি বললাম তাকে সপরিবারে বিহার থেকে আনতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তার অর্ধেক আমি একা দেবো, বাকিরা আপনারা সকলে মিলে দেন: তখন এভাবেই তাকে আনার ব্যবস্থা হলো।'

ইসলামের জন্যে, জাতির জন্যে নিবেদিতপ্রাণ নিঃস্বার্থ ও প্রচারবিমুখ মওলানা আবদুর রশীদ মরহুমের এ বক্তব্যটি লিখিতভাবে প্রচারিত বা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি।

গণভোট বিজয়ে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনকারী সিলেট জেলা মুসলিম লীগের তদানন্তীন সাধারণ সম্পাদক ভার্থখোলার হাজী মনিরুদ্দীন চৌধুরী (কবি দিলাওয়ায়ের পিতৃব্য)-এর কথা আবুল মাল আবদুল মুহিতসহ অনেকেই উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব তাতে ফুটে উঠেনি। তিনি তাঁর পিতা আবদুল হাফিয সাহেবের বাড়ীতেই গণভোট তথা মুসলিম লীগের অফিস থাকার সুবাদে তাঁকেই গণভোট যুদ্ধের প্রধান নায়করূপে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং সে অফিসে অহরহ যাতায়াতকারীদের তালিকায় হাজী মনিরুদ্দীন ও মাওলানা রশিদের (আসলে আবদুর রশিদ) নাম উল্লেখ করেছেন মাত্র। অথচ সাংগঠনিক কারণেই মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রেসিডেন্টরূপে তাদের ভূমিকাই ছিল সর্বাগ্রগণ্য।

মাওলানা সৈয়দ তাফাজ্জুল হোসায়ন তাঁর উস্তাদ ও মুর্শিদের জীবনী লিখেছেন বটে, কিন্তু রাজনীতির ময়দানে বা আসলে কর্মক্ষেত্রে কার কতটুকু গুরুত্ব তা তাঁর কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। তবে তিনি তার গ্রন্থটিতে যাদের বাণী সংযোজিত করেছেন বরং যাদেরকে দিয়ে তিনি পুস্তকটির পরিচিতি লিখিয়েছেন সেই গুরুত্বপূর্ণ মনীষীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলানা আবদুর রশীদকেই স্থান

দিয়েছেন। তারপর তাঁরই শাগরেদ ও চাচাতো ভাই মওলানা সিরাজুদ্দীন আহমদকে। এমনটি করতে তাকে কে বাধ্য করেছিল?

হাজী মুনিরুদ্দীন চৌধুরী সাহেবকে আমি সত্তরের দশকেই তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে কৌতুহলভরে জিজ্ঞেস করলাম, গণভোট ও মুসলিমলীগের বিশাল কর্মযজ্ঞে সবচাইতে বড় ভূমিকাটি কার ছিল?

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করেই তিনি জবাব দিলেন, নিঃসন্দেহে মুসলিম লীগের তদানীন্তন সভাপতি মাওলানা আবদুর রশীদের। এজন্যেই তো তাঁকেই এ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল এবং এজন্যেই তাঁকে দিয়েই পাকিস্তানের প্রথম প্রভাতে ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক অপসারণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে সিলেট জেলা আদালত শীর্ষে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করানো হয়েছিল।

আমি তাঁকে পুনরায় কৌতুহলভরে প্রশ্ন করলাম, চাচাজান! দেশে এত দেওয়ান চৌধুরী শ্রেণীর হর্তাকর্তা ব্যক্তিত্ব থাকতে এমন একজন মাওলানাকেই কেন বেছে নেয়া হলো যিনি বংশে তালুকদার হলেও (এর দালিলিক প্রমাণ আমার কাছে মওজুদ রয়েছে) মৎস্যজীবী সমাজের নেতা বলেই যিনি পরিচিত। মাওলানা আবদুর রশীদের বিশ্বস্ত সহকর্মী ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক অকপটে জবাব দিলেন, বাবা! মুসলিমলীগের প্রয়োজনে অর্থব্যয়ে তো চৌধুরী জমিদাররা অত্যন্ত কুণ্ঠিত ছিলেন। সেখানে মওলানা আবদুর রশীদ ও মুসলিম মৎস্যজীবী সমাজ অকুণ্ঠে নানা ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

এ-ই ছিল মওলানা আবদুর রশীদের মুসলিম লীগের সভাপতি এবং স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম ভোরে সিলেটের আদালতশীর্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন দেশের পতাকা উত্তোলনের গূঢ় রহস্য। তিনি মাওলানা সহূল উছমানীকে তাঁর উস্তাদরূপে উল্লেখ করে গণভোট বিজয়ের প্রধান উপাদান ছিল তাঁর দুআ ও অক্লান্ত পরিশ্রম বলে উল্লেখ করেছেন। বন্ধুবর দেওয়ান নুরুল আনোয়ার চৌধুরী তাঁর সিলেটে গণভোট প্রবন্ধে লিখেন উত্তর সিলেট মুসলিম লীগের সভাপতি অনূদিত (অনুবাদক ও প্রকাশকের নাম তিনি ঐ প্রবন্ধ উল্লেখ করেননি) মাওলানা থানবীর তানযীমুল মুসলিমীন গোটা সিলেট জেলায় অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি করে। তাঁর এ প্রবন্ধটি প্রথমে ইফা প্রকাশিত সাপ্তাহিক অগ্রপথিকে (এখন তা মাসিক) এবং পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল বহরুল উলুম মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন লিখেন: সিলেটের গণভোটে আমার উস্তাদ হযরত সাহূল উছমানী (র)-এর অবদান ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখিত থাকবে। ঐ প্রয়োজনীয়

মুহূর্তে তিনি সিলেটে না আসলে গণভোটে বিজয় লাভ ও পাকিস্তান অর্জন যে ছিল অসম্ভব ব্যাপার সকলেই এ সত্যটি অকপটে স্বীকার করে থাকেন।

১৯৬২ সালে সিলেট থেকে নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য জননেত্রী বেগম সিরাজুননেসা রশীদ (স্পিকার হুমায়ুন রশীদের আম্মা) বলেন: মাওলানা সাহূল উছমানীর সিলেট আগমন ও প্রচেষ্টা ছাড়া সিলেটের গণভোট বিজয় কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের পক্ষে তার ফতোয়ার কার্যকারিতার এ ব্যাপারে বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

স্বাধীনতার পূর্বে তদানীন্তন বৃহত্তম আসাম প্রদেশের রাজধানী শিলং এর এবং তারপর সিলেট জেলার ডেপুটি কমিশনার সৈয়দ নবীব আলী চৌধুরীর অনুরূপ স্বাক্ষ্যও বিদ্যমান রয়েছে। সর্বমহলে স্বীকৃত তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সিলেট শহরের রিকাবী বাজার থেকে দক্ষিণগামী সড়কটির নামকরণ করা হয়েছিল মূল উছমানী রোড নামে।

মাওলানা সহূল উছমানীর জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি জরুরী তথ্য

যেহেতু এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে সিলেটের গণভোটে মাওলানা সহূল উছমানীর অবদান, তাই তাঁর জীবনী সংক্রান্ত তথ্যগুলো সেভাবে আসেনি। অথচ এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ মহাপুরুষের জীবনের সেসব দিক সম্পর্কে পাঠকদের কৌতূহল থাকাটাও খুবই স্বাভাবিক। তাই সে তথ্যগুলোও সংক্ষেপে নিম্নে দিয়ে দেয়া হল।

- জন্ম : বিহারের পাটনা জেলার ভাগলপুরস্থ পুরীণীগ্রামে **১২৯৫** হিজরী সনে।
- **বংশপরিচিতি :** তিনি ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উছমান (রা)-এর ২৬তম অধঃস্তন বংশধর। তাঁর **১১**তম পূর্বপুরুষ শায়খ আফকাহুদ্দীন **১০৫৭** হিজরীতে বাগদাদ থেকে ভারতে এসে বিহারে বসবাস শুরু করেন। তাঁর প্রপিতামহ সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র বিজ্ঞ আলেম ও কৃতী সিপাহসালার ছিলেন। তিনি বিখ্যাত 'ফতোয়ায়ে আলমগীরী'র অন্যতম প্রণেতা ও স্বাক্ষরকারী ছিলেন।
- **শিক্ষা :** তিনি মাতৃভূমি ভাগলপুর, কানপুর, হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ ও দেওবন্দ দারুল উলূমে লেখাপড়া করেন।
- **জ্ঞানপিপাসা:** দীর্ঘ দু'মাস পায়ে হেঁটে মওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহ্সারামী প্রমুখ ৫ জন সঙ্গীসহ দক্ষিণাত্যে পৌঁছে নিযাম হাদ্রাবাদের মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন।

- **বিশিষ্ট উস্তাদবর্গ :** মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী, মাওলানা মুহাম্মদ ফারূক চিড়িয়াকোটী আজমগড়ী (যাঁর শিষ্যরূপে আল্লামা শিবলী নু'মানী গর্বপ্রকাশ করতেন), মাওলানা আবদুল ওহ্হাব বিহারী, মাওলানা লুতফুল্লাহ আলীগড়ী, শায়খুল হিন্দ। মাওলানা মাহমূদুল হাসান প্রমুখ।
- **কর্মক্ষেত্র :** প্রখর মেধা ও যোগ্যতাবলে ফারিগ হওয়ামাত্র শাহজাহানপুর মাদ্রাসার সদরুল মুদার্রিসীন পদে নিযুক্ত হন। তারপর ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় তিনটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা, দেওবন্দ দারুল উলূম ও সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় এবং মাঝখানে ১৬ বছর পাটনা ইসলামিয়া শামসুল হুদা মাদ্রাসায় প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। দেওবন্দ দারুল উলূমে ৮ বছর শিক্ষকতা এবং ৩ বছর মুফতীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৫০ হিজরী থেকে ১৩৬২ হিজরী পর্যন্ত ১২ বছর তিনি উক্ত মাদ্রাসার মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন।
- ১৯১৩ সালে হযরত শায়খূল হিন্দ তাঁর হজের সফরে তাঁর যে বিশিষ্ট ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ১০ জন শাগরেদকে সফর সঙ্গীরূপে নির্বাচন করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের শীর্ষস্থানীয়। শায়খুল হিন্দ বন্দি হয়ে মাল্টার নির্বাসনে যাওয়ার প্রাক্কালে যাদেরকে দেওবন্দে ফিরে তাঁর মিশন চালিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে মদীনা থেকে দেওবন্দে ফেরত পাঠিয়েছিলেন তাঁদেরও অন্যতম।
- তাঁর শিষ্য-শাগরেদদের মধ্যে দেওবন্দের শায়খুল আদব ওয়াল ফিক্হ্ মাওলানা এজাজ আলী ও সিলেটের বাহরুল উলূম মাওলানা মুহাম্মদ হোসায়ন নিজপাটী জয়ন্তিয়াপুরীও রয়েছেন– যিনি কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ ও পরবর্তীতে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালরূপে প্রভূত সম্মান ও যশখ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন।
- **তাসাওউফ সাধনা :** ১৩২৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহীর নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন। কিন্তু তিনি নিজে তা গোপন রাখেন। পরবর্তীতে হযরত শায়খুল হিন্দের খলিফারূপে যখন তাঁর নাম প্রকাশিত হয়, তখন জানা যায় যে, ইতিপূর্বেই তিনি গাঙ্গুহী (র)-এর খিলাফত লাভ করেছিলেন।

খলিফাবৃন্দ: তাঁর কাছে মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্যে আগতদেরকে হয় হযরত থানভী, না হয় মাওলানা মাদানীর খেদমতে পাঠিয়ে দিতেন। কেবল নাছোড়-বান্দাদেরকেই মুরীদ করতেন। তাঁর খলিফা হওয়ার জন্যে আলেম হওয়া জরুরী ছিল। তিনি বলতেন, আমার খলিফাদের সকলেই এলহামী খলিফা। অর্থাৎ

আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কারো ব্যাপারে আধ্যাত্মিকভাবে নির্দেশিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে তিনি খিলাফত দিতেন না। তাই তাঁর খলিফার সংখ্যা খুবই কম। তাঁদের সংখ্যা মাত্র এগার জন। নিম্নে তাঁদের নাম ঠিকানা দেয়া হল।

১. মাওলানা আলহাজ হাফিয দিয়ানত আহমদ মৌজা ডহরপুর, ভাগলপুর

২. মাওলানা আলহাজ কারী মুহাম্মদ ইব্রাহিম আহমদাবাদী, জুনাগড়

৩. মাওলানা আলহাজ কারী সায়্যিদ আহমদ মুঙ্গেরী, বিহার

৪. আলহাজ মওলভী সায়্যিদ শাহ নাজমুদ্‌দীন দরিয়াপুর, বাঁকিপুর, পাটনা

৫. মাওলানা সায়্যিদ শাহ্ জমীলুল হক, সৈয়দপুর, থানাঃ জগন্নাথপুর, সিলেট

৬. মাওলানা সায়্যিদ কারী আবদুর রঊফ, সৈয়দপুর, থানাঃ জগন্নাথপুর, সিলেট

৭. মাওলানা সায়্যিদ আহমদ, থানাঃ জগন্নাথপুর, সিলেট

৮. মাওলানা কারী সায়্যিদ হাবীবুর রহমান, থানাঃ জগন্নাথপুর, সিলেট

৯. মাওলানা আবদুল ওহ্‌হাব সাহেব, থানাঃ জগন্নাথপুর, সিলেট

১০. মাওলানা আবদুল হাসিব, পঞ্চগ্রাম, পোস্ট সদরপুর, জেলা কাছাড়, আসাম

১১. মাওলানা সায়্যিদ তাফাজ্জুল হোসায়ন, সিলেট সরকারী মাদ্রাসা

দ্র. মুফতী সহূল উছমানী লিখিত 'রূহুত তাসাওউফ' এর উপসংহাররূপে তাঁরই পুত্র উস্তাদপ্রবর মাওলানা আহমদ উছমানীর 'হাকীকাতুল ওসুল' এর বরাতে করাচী থেকে সদ্যপ্রকাশিত ভাগ, পৃ-৭১।♦

বঙ্গবন্ধু : বাংলার স্বরলিপি

সোহরাব পাশা

আমি তো ভাষার ক্রীতদাস
বাংলা আর বাংলাদেশ আমার পবিত্র উচ্চারণ
আমার স্বপ্নের ধ্রুপদী আলোর ল্যাম্পপোস্ট স্বর ও ব্যঞ্জন
রাত্রির পাতায় খোলে অবিনাশী ভোর
রোদের পাপড়ি ঝরে নিরিবিলি শিমুল-পলাশে
মৃত্তিকায়, ঘাসে ফোটে নিবিড় উজ্জ্বলতার স্নিগ্ধ কোলাহল,
এইখানে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে বিনয়ী বৃক্ষের দীর্ঘ ছায়া
পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই এমন অমিয় আশ্রয়ের মায়া।

এখানে আঙুলে ফোটে আগুনের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল
শ্রেষ্ঠ শিল্পী মুক্তিসেনা শোণিতে এঁকেছে স্বদেশের মুখ
মেঘলা সন্ধ্যায় বিরুদ্ধ হাওয়ায় মাথা নত করে না এদেশ
শহিদ মিনারগুলো অনুবাদ করে প্রাণের পঙ্‌ক্তিমালা
ওরা আঁধার রাতের দৃপ্ত আলোর মিছিল-অমিত সাহস
দূরবর্তী বেভুল দ্বীপের জ্যোতির্ময় বাতিঘর।

এইখানে জ্বলে ক্ষিপ্র সূর্যের অপূর্ব চিত্রকল্প
অমিতাভ চেতনায় বিনিদ্র রবীন্দ্র-নজরুল
রংধনু রোদের শব্দে আঁকা সেরা কবি জয়নুল
এইখানে হঠাৎ বিষণ্ন রাত্রি নামে-বেদনায়
পাখিরাও ভুলে যায় ডানায় রচিত স্বপ্নভাষা
পচাঁত্তরে পনের আগস্ট শোকভেজা স্বরলিপি
আমার প্রাণের বর্ণমালা আর স্বদেশের মাটি
নিরন্তর জ্বলে অনির্বাণ শিখা শোকের দহন।

হে স্বদেশ ‘এখন দুখিনী’ নও আর
চারদিকে জেগে আছে দেখো ঘুম ভাঙানো পাখিরা
নিঝুম রাত্রির শেষে ডাকে ওই সুবর্ণ সকাল
এখনো উদ্ধত ওই বঙ্গবন্ধুর দৃপ্ত তর্জনী।
বঙ্গবন্ধুর নামে হেসে ওঠে প্রিয় বাংলাদেশ।

সুর-নির্ঝর অনুপম রবিশংকর

শামসুল ফয়েজ

সেতারের তারে নিপুণ আঙ্গুল চলে;
তৈরি হয় মধুর সুরের মোহনীয় ইন্দ্রজাল।
রবিশংকর আলী আকবর খাঁ
বানায় যুগলবন্দী সরোদে-সেতারে

তাদের ছোঁয়ায় খাঁচামুক্ত পাখী
পাখা মেলে উড়ে যায় শংকাহীন নীলিমায়।
লক্ষ লক্ষ মানুষের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে
বাজতে থাকে সুখের ঝংকার।

তার দরদের আয়োজনে পয়মন্ত হয়ে যায়
অধিকৃত বাংলার নি.... মানুষের মুক্তির কনসার্ট।

বেহলার যাদুকর মেনুহিনও
অভিভূত হয়ে পড়ে
রবিশংকরের সেতারের
অভূতপূর্ব বিনম্র মূর্চ্ছনায়।

আটলান্টিকের ওপারে
জর্জ হ্যারিসনের গীটার
মাতোয়ারা হয়ে চুমু খায় রবিশংকরের সেতারে।

সাপের সগতোক্তি

রেজাউদ্দিন স্টালিন

গর্তে আমার থাকাটা ছিলো ভার,
এই শ্রাবণের বর্ষাতে দুর্বার–
প্লাবণ এলো মৃত্যু এলো ভয়।

আমার দাঁতে বিষের অপচয়–
রোধ করতে লোক সমাজে এসে
মরছি আমি বিরুপ পরিবেশে।

আমার চেয়ে মনুষ্য সাপ বেশি
বাধ্য হয়ে হয়েছি সন্ন্যাসী।

অভিমান
সিরিয়া খান লোদী

আমারও অভিমান আছে
অভিমানের মেঘ ঠাঁয় আমার
আঙিনায় গোঁ হয়ে বসে থাকে,
এক চুল পরিমাণও নড়ে না সে।
সন্ধ্যা দুপুর আষ্টেপৃষ্ঠি
অবুঝ শিশুর মায়ের
আঁচল ধরে বায়না করার মতন
জেদ নিয়ে,
ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে থাকে সে।
অভিমান বুকের ভেতর
দুঃখ নদীর ঢেউ
আথারে পাথারে গুম মেরে থাকে।
আমারও অভিমান আছে
অভিমানের মেঘ ঠাঁয় আমার
চোখের জল ভরে, কাঁখের কলস হয়ে ভাসে।

চিত্রা হরিণীর মায়াবী চোখের ছায়া

আবু মুসা চৌধুরী

শেষ হলো শীতঘুম।
জাড্য কেটে গেছে। আবার বসন্ত এসে আমার এ
ম্লান বারান্দায় দেখো, গোপন গোলাপ আর
বাগানী বিলাসের লাল-সাদা ঝাড়ে
তাহাদের ফুল্ল ত্বকে
ফাগুনের আগুনের
আপ্যায়ন...।

আমাদের কাছাকাছি কোনো পলাশ ও
শিমুলের লোহিত লাবণ্য নেই
সে ঝালর ও লালের যৌন আবেদন
আমাকে আহ্বান করে নেবে।

এ বছর যেতে হবে দূরে।
বালিয়াড়ি বা পাহাড় ঘেঁষা
ঝিরির সমীপে;

জানি না অরণ্য আজ কেমন রয়েছে
পাখিদের সমাজে তো কোনো
লকডাউন নেই−

আমাদের ফের দেখা হবে,
হতে পারে-চিত্রা হরিণীর মায়াময়
চোখের ছায়ায়।

সমতার গান
বদরুল হায়দার

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তুমি একাকিত্বে
গন ভালোবাসার অজ্ঞতা কিনে
মগ্নতায় রাখো তোমার অপারগতা।

সত্য চিরঋণী হতে থাকে অনিয়মের প্রীতিতে।
যথাযথ ব্যবস্থার নীতিতে আমিও সমর্থিত
মতামতের ভীতিতে অবনতি মেনে নিই।

বস্তুর বিকাশে সারা দুপুর নুপুর পায়ে
হেঁটে বেড়ায় নিমিষে। সুমধুর
মনভোলা অপারগতার দোলা দেয় পরিহাসে।

গোয়েন্দা হৃদয় ফাঁদে ফাঁদে প্রেমিক জীবন।

তোমার সংঘাতের সমাবর্তনে শুরু হোক
আমাদের মিলন র‍্যালির আয়োজন।

তুমি ভুল সূচকের সংশোধনের রূপকে
দ্বৈত লোকেশনে খোঁজো নগদ বিধান।

আমি পরিক্ষিত সমতার সন্ধানে কূটনীতিতে আনি
ভুলে ভরা সমতার গান।

ভালোই আছি
হাসানাত লোকমান

নির্জনতার অরূপ নেশায় মনটা আমার হারায় না
সুখের নেশায় আকুল হয়ে মুক্ত মাঠে দাঁড়ায় না
প্রেম পিপাসায় হৃদয় আমার দু'হাত এখন বাড়ায় না
রাত-দুপুরে স্মৃতির ঘরে স্বপ্ন কড়া নাড়ায় না
আঙিনাতে তোমার হাসি চন্দ্রবাতি জ্বালায় না।

কষ্টগুলো বুকের ভেতর বেশতো আছে,
পাখির মতো খাঁচা ভেঙে পালায় না
কারো হাতের ফুলের ছোঁয়া এখনতো আর
বিজনরাতে সুখের ঘুম পাড়ায় না
এই অবেলায় তোমার সাথে না হোক দেখা,
তবুও আছি–
বেশতো আছি
ভালোই আছি
নিজের ভেতর
একলা একা!

অমানবিক

সাদিক মোহাম্মদ

ভূমির সঙ্গে
জীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য
পায়ের নিচের জমিটুকু
মৃত্যুও কেড়ে নিতে পারে না কোনোদিন
পৃথিবীতে উদ্বাস্তুর কোনো সীমারেখা নেই
মাটিই মানুষের একমাত্র উত্তরাধিকার।

মানবতা যদি
নোংরা ষড়যন্ত্রের পক্ষ নেয়া হয়
তবে জেনে রেখো আমি আজন্ম অমানবিক।

বাবা ও বাংলা ভাষার গল্প

জব্বার আল নাঈম

বাবা অসুস্থ। হাঁটতে পারেন না। কথা আটকে যাচ্ছে বার বার। দিনের অধিকাংশ সময় শুয়ে থাকেন। মাঝে মধ্যে বসার চেষ্টা করেন, তাও অন্যের সহযোগিতায়। বসিয়ে দিলেও থাকতে পারেন না, ধরে রাখতে হয়। বালিশ-বেষ্টনিতে রাখতে হয়। মায়ের অনুপস্থিতে বাবা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। শরীরের কোনো অংশই বুঝ মানছে না। একটা সময় বাবার শরীরের চামড়া আজকের আমার মতোই টান টান ছিল। এখন কুচকে গেছে। শরীরের প্রতি অঙ্গ অংশে ভাঁজ। এখন ঠিকঠাক কিছুই দেখতে পারছেন না। মাঝে মধ্যে আমাকেও চিনতে কষ্ট হয়। মুখে দাঁত নেই। বাহুতে নেমেছে বার্ধক্য। দাঁড়ানোর শক্তি নেই। বাবার মাথায় ছিল বাহারি রঙের কেশ, অথচ এখন কেশ শূন্য। স্মরণ শক্তিতেও আগের তীক্ষ্মতার অভাব। নিজের নামও ঠিকঠাক মনে রাখতে কষ্ট হয়।

ঘরে বাবা আর আমি। কাজের লোক নেই। মফস্বলের বাড়িতে কাজের লোক পাওয়া দুষ্কর। বাধ্য হয়ে রান্না ঘরে যেতে হয় আমাকে। বাবার গোসল থেকে ঔষধ খাওয়ানো এক হাতে সামলাতে হয়। পায়খানা প্রস্রাব আমি ছাড়া কে পরিষ্কার করবে। কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই এসব সম্পন্ন করি। এ নিয়ে বন্ধুরা নাক ছিটকায়। কেউ আমার সঙ্গে মিশতে চাইত না। নিজেকে বুঝ দিতাম– বন্ধুদের ব্যস্ততা বেড়েছে। যদিও আগে অনেকের সঙ্গে কারণে-অকারণে দেখা মিলত। আড্ডা হলো বাঙালির প্রাণ। না দিতে পারলে মন খারাপ হয়ে যায়। আমিও হাঁপিয়ে উঠি। আবার মনকে সান্ত্বনা দেই। এই মুহূর্তে আমি ছাড়া বাবার কাছে দ্বিতীয় কেউ নেই। বাবাও অন্য ভাইবোনদের চেয়ে আমার সঙ্গ উপভোগ করেন।

পাঁচ ভাই, চার বোনের ছোটো আমি। বড়ো ভাই জেলা শহরের নামকরা আইনজীবী। বাবাকে দেখার সময় হাতে নেই তার। দারুণ ব্যস্ততা আইন চর্চায়। ভাবির অভিযোগ সন্তানদেরকেও সময় দেয় না ভাই। দ্বিতীয় ভাই আইটি স্কলারশিপে স্বপরিবারে থাকেন অস্ট্রেলিয়ায়। তা-ও প্রায় নয় বছর। বিয়ে করেছেন ওই দেশের মেয়ে। ওখানে কাজের মূল্য অনেক। বসে থাকারও সুযোগ কম। নানা ব্যস্ততার কারণে দেশের কথা ভুলেই আছেন ভাই-ভাবি। বড়ো বোন স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় স্থায়ী। পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করেন দুলাভাই। শ্বশুর বাড়িতে একগাল কুলি ফেলার সময় কম। দ্বিতীয় বোনের স্বামী উপজেলা শহরের পৌর মেয়র। মানুষের অভাব-অভিযোগের বিচার আচার রাজনীতি নিয়ে থাকতে হয় তার। নগর পিতাকে যোগ্য সঙ্গ দিতে হয় নগর মাতার। এত কাছে থাকার পরও আসার সময় থাকে না। তৃতীয় ভাই ইসলামিক স্কলার। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পাশ। দেশ-বিদেশে ওয়াজ মাহফিল করে মানুষকে হেদায়েতের বাণী শোনায়। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে একটি বড়ো মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম। পর্দানশীল স্ত্রী পর পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে ভাইয়ের নিষেধ আছে। এমনকি শ্বশুরের খেদমতও করা যাবে না।

আমার বড়ো ভাই মেডিকেল ডিগ্রী নিতে লন্ডন গেছেন বছর তিনেক আগে। সেখানে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। হবু ভাবি বাংলাদেশি মেয়ে। পরিবারের সঙ্গে সেখানে থাকেন। বিয়ের পর স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছে ভাইয়ের। বাংলাদেশ ভালো লাগেনি। এখানে বসবাসের সুন্দর পরিবেশ নেই। একজন আরেকজনের পেছনে লেগে থাকে। ধান্ধাবাজির পেছনে ঘুরঘুর করে। কে কার ক্ষতি করবে সেই ফন্দি আঁটে। আবার মেধাবী ও যোগ্যদের মূল্যায়ন করা হয়নি ঠিক মতো। আবেগে ভরপুর জাতি। অযোগ্যদের জন্যেই বাংলাদেশ। চাষাভূষা আর কৃষকের

দেশ এটা। এসব ভাইয়ের একান্ত ভাবনা। তাঁর সিদ্ধান্ত দেশে ফিরবেন না। তৃতীয় বোন ও ভগ্নিপতি দুইজনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার। ফুটফুটে একটি মেয়ে সন্তানের জননী। আমাকে পছন্দ করে। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে গিয়ে নানার সঙ্গেও কথা বলতে চায়। সে জানে না এসবের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই নানার। একদম ছোটো বোন বিসিএসের প্রশাসন ক্যাডার। কয়েকদিন পরপর তার অফিস বদলি হয়। সেই সুবাধে পালটাতে হয় বাসা-বাড়ি। ছেলেটা জন্ম থেকেই বধির। দেখাশোনার জন্যে লোক রেখেছেন একজন। চিকিৎসা করতে কয়েক বার দেশের বাইরে পাঠানো হয়েছে। সুস্থ আর হয়ে ওঠেনি।

০২.

বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করেও দীর্ঘদিন বেকার আমি। চুপচাপ দেখছি, এ নিয়ে কারো উদ্বিগ্নতা নেই। এমনকি কেউ ভাবছেও না। সৌজন্যতা দেখিয়েও কেউ কিছু বলেনি। মাঝে মধ্যে আশপাশের মানুষ ও পৃথিবী নিয়ে বিস্মিত হই। কেউ কেউ জানতে চায়, কেনো চাকরি করছি না? আবার কারো কারো ধারণা একাডেমিক রেজাল্ট ভালো নয়। নয়ত ঢাকায় ঠিকঠাক লেখাপড়া করিনি। চাকরি না হওয়ার অন্য কোনো কারণ নেই। চাকরির জন্যে যে চেষ্টা করিনি এমন নয়। হয় না। নিজের হীনমন্যতা বাড়তে থাকে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায়। অথচ পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে সরকারি স্কলারশিপ পেয়েছি। এসএসসি ও এইচএসসিতে গোল্ডেন এ প্লাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে অনার্সসহ মাস্টার্স। সেই আমি চাকরি না করাটা মানুষের কাছে যেমন অবিশ্বাসের ঠেকে, নিজের কাছেও অবিশ্বাস্য লাগে। যখনই বাবাকে বলতাম আমার চাকরি হচ্ছে না কেনো? বলতেন– একদিন হবে। রোজ রোজ বাবার এমন কথা শুনে বিরক্ত লাগত। জানি না সেই একদিন আর কবে! আবার এটাও ভাবি, চাকরি হয়ে গেলে কে বাবার দেখা শোনা করবে? কার আশ্রয়ে রাখব? তখন মনে হয়, চাকরি না হওয়াটা আরো ভালো।

প্রেমিকার নাম গুলবদন। ফোনালাপ হলেই জানতে চায়, কবে বিয়ে করছি। অথচ এর সঠিক জবাব আমার কাছে নেই। এ নিয়ে কোনো দিন ঝগড়া থামেনি বরং বেড়েছে। লেখাপড়া শেষ করে হ্যান্ডসাম সেলারিতে কর্পোরেট চাকরি করছে সে। তা-ও তিন বছর। বউ চাকরি করবে আমি বেকার বসে খাবো এমন ছেলে আমি না। চাকরি হলে তারপরই বিয়ের পিঁড়িতে বসব। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি। গুলবদনও চেষ্টা করছে আমার চাকরির জন্যে। হচ্ছে না। এক চাকরি

হচ্ছে না তার উপর পরিবারের চাওয়া ছোটোখাটো চাকরি করা যাবে না। পরিবারের সম্মানে লাগবে।

প্রেমিকার বিয়ে প্রতিদিনই হয়– এমনটা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। সেই রাখাল ছেলে আর জঙ্গলের বাঘের গল্পের মতো, সত্যি সত্যি একদিন বাঘ এসে রাখাল ছেলেকে খেয়ে ফেলবে। গুলবদন বিয়ে করে স্বামীর সংসার শুরু করবে। বছর শেষে জন্ম নেবে ফুটফুটে সন্তান। এভাবে কতদিন একজনকে স্বপ্ন দেখিয়ে থামিয়ে রাখা যায়? আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতেও পারছে না গুলবদন। এটা তার দোষ নয়। তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছি আমি। ভাবাতে বাধ্য করেছি। স্বাভাবিকভাবেই অন্য কাউকে ভাবতে পারছে না সে। গুলবদন অন্য কোথাও বিয়ে করলে আমি নিঃসঙ্গই থেকে যাব। গুলবদন এ জন্যেই অপেক্ষা করছে। কিন্তু একটা মেয়ে কতদিন অপেক্ষা করবে সেটাও ভাবছি। এমন অনেক ভাবনা আমাকে উন্মাদ হতে সাহায্য করবে।

০৩.

মুহতামিম ভাইয়ের দুই ছেলেকে পছন্দ করেন বাবা। তারাও বাবাকে পছন্দ করে। মাঝে মধ্যে বেড়াতে এসে সালাম দিয়ে বাবার কাছে বসে, ইহকাল, পরকাল, নামাজ, রোযা, আহকাম-আরকান প্রসঙ্গে কথা বলে। বাবা খুশি হন। তারা আরবি পড়ুয়া বলেই যে বাবা খুশি তা নয়, আরেকটা কারণ, তারা বাংলায় কথা বলে। খুশিতে চোখে পানি ঝরে বাবার। অন্য ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে। বাংলা উচ্চারণ পারে না বলা যায়। অথচ অন্য ভাষায় কথা বলা বাবার অপছন্দ। তাই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় পড়তে বাধ্য

করেছেন। বাবার কথা পৃথিবীতে একমাত্র আমরাই ভাষার জন্যে রক্ত দিয়েছি। মিছিল করেছি। ভাষা আন্দোলনে বাবার গায়ে গুলি লেগেছিল। সেই ক্ষত এখনও তাজা। যাকে রক্ত দিয়ে অর্জন করেছি তাকে অন্যের প্রেমে পড়ে বর্জন করব না! এমন ইতিহাস কেনো অস্বীকার করব। যখন যে ভাষার প্রয়োজন তখন সেই ভাষা ব্যবহার করব। কিন্তু নিজেরটাকে চিরতরে বাদ দিয়ে নয়। ভাইবোনের ছেলেমেয়ে মোট তের জন। এগারজনই কথা বলে ইংরেজিতে। এমনটা বাবার অপছন্দ। বাংলা ভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষার চর্চা করা যেতে পারে। বাঙালি হয়ে অন্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা চর্চাটা একেবারে বেমানান। তারা জানে না ঠাকুরমার ঝুলি কী? লেখক কে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিসের জন্যে নোবেল পেয়েছেন? তিনি কোন ভাষার কবি? কাজী নজরুল ইসলাম কোন ভাষার জাতীয় কবি? এমন ছেলেমেয়েরা হয়ত পটরপটর ইংরেজি বলতে পারবে, প্রাণ খুলে বাংলা বলতে পারবে না। নব্বই শতাংশ কৃষকের দেশে পটরপটর ইংরেজি বলা মানুষকে কেউ পছন্দ করবে না। করলেও দূরত্ব বজায় রেখে চলে। জানা সম্ভবও না। কারণ, ইংরেজি বাংলার মতোই একটি ভাষা। ইংরেজরা প্রভূত্ব সব দেশের উপর চাপিয়েছে। বাংলাকে আমরা রক্ত দিয়ে অর্জন করেছি। অর্জন করা জিনিস ছোটো হলেও আনন্দের।

বেকারত্বের ফলে নিজের উপর এক ধরনের অবসাদ নেমে এসেছে। অবসাদ কাটাতে বাড়ির পাশের কিন্ডার গার্টেনে বাংলার ক্লাস নেই। ছাত্রছাত্রীরা আমাকে পেয়ে খুশি। তাদেরকে বাংলা ভাষার গুরুত্বের প্রসঙ্গ বলি। বিশুদ্ধভাবে বলতে ও লিখতে চেষ্টা করে তারা। আঞ্চলিকতা পরিহার না করতে বলি। এটি ভাষার অলংকার। সৌন্দর্য। আঞ্চলিক ভাষায় নতুন নতুন শব্দের সন্ধান মিলে। আমার সামান্য কাজে বাবাকে খুশি খুশি লাগে। ভাষা নিয়ে আগ বাড়িয়ে কথা বলেন। বাংলা ভাষার অগ্রগতি কতটুকু শুনতে চান। সেই থেকে আমরা বন্ধুর মতো বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠি। মৃদু-মন্দ পক্ষ-বিপক্ষ বা তর্ক-বিতর্ক হয়। যদিও এর সবটুকুই মধুর। বাবা রেগে গেলেও আমি সহজ করে ফেলি। তখন বাবা বলেন, তুমি শিক্ষক হিসেবে যোগ্য।

অনেকদিন পর খেয়াল করলাম বন্ধু-বান্ধব ছাড়া দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারছি। বাবার মতো বন্ধু পেলে অন্যদের প্রয়োজন কমে আসে। এই বয়সেও বাবা অনেক আধুনিক। ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দেন। বিজ্ঞান সম্পর্কে অনর্গল বলতে পারেন। জানতে চান আমার প্রেমিকা গুলবদনের কথা। গুলবদন একাধিকবার এসে বাবাকে দেখে গেছে। মায়ের সঙ্গে প্রথম দেখার স্মৃতিচারণ করেন বাবা। বাবার জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা। সেসব বলতে থাকেন। আমিও মুগ্ধ পাঠকের

মতো শুনি। সেলজুক সাম্রাজ্য থেকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাস, আমেরিকার উত্থান পর্ব ও আধিপত্যের কাহিনি, ইউরোপ যেভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, সেসবও বলেন। মোঘল সাম্রাজ্য যতটা না অন্যের তারচেয়েও বেশি নিজেদের কারণে পতন ঘটেছে। এরই পরম্পরাই জানতে পারি সাতচল্লিশের ভারত-পাকিস্তান। একাত্তরে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হওয়ার ঘটনা। চাকরি প্রার্থীর জন্যে বিষয়গুলো উপকারী। বাবার মস্তিষ্ক আগের মতো তীব্র ও তীক্ষ্ম হচ্ছে ভেবে ভালো লাগছে। দেখলাম বন্ধুত্ব নির্দিষ্ট বয়সের কোনো মানুষের সঙ্গে নয়। একজন জানাশোনা মানুষের সঙ্গে। বাবা ঠিক তাই।

দ্বিতীয় বোন উপজেলায় থাকেন। মাঝে মধ্যে বাড়িতে ঢুঁ মারেন। আমাকে নিয়ে বাবার সঙ্গে পরামর্শে বসেন। কেনো চাকরি করছি না। বিয়ে করে সংসার করছি না। আরো কত কী। দ্বিতীয় বোনের উপর খুশি আমি। কারণ, বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন। একদিন বাবাকে বলেন, ও কিন্ডার গার্টেনে শিক্ষকতা করে-কীভাবে চলবে? বিশ্ববিদ্যালয় পাশ একটি ছেলে কিন্ডার গার্টেনে শিক্ষকতা করলে সম্মান থাকে? সমাজে মুখ দেখাতে পারব? চাকরি না পেলে প্রয়োজনে বেকার থাকবে। জমিজামা চাষ অথবা বিক্রি করে খাবে।

আপার কথায় হাসি পেল। চলে যাওয়ার সময় কড়া কণ্ঠে বলে গেলেন, কিন্ডার গার্টেনের চাকরি ছেড়ে দেই যেন। বেকার থাকার চেয়ে কিছু করা ভালো। কিছু করতে গিয়ে কারো মনে আঘাত লাগাটা বেদনাদায়ক। বুঝতে পারছি না, বাচ্চাদের পড়ালে সম্মান কীভাবে যায়! বাচ্চাদের পড়াতে ভালো লাগে আমার। ওরা শিখতে চায়। আমিও শেখাতে চাই। এটা ভালো পারি আমি। আপার সিদ্ধান্ত অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। বাবা এ বিষয়ে আপাকে কিছু না বললেও আমাকে ডেকে বললেন স্কুলে নিয়মিত যাও। ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে পড়তে চায় তা রপ্ত করো। স্কুলের প্রেমে পড়িও না।

প্রতিদিনের মতো বাবার সঙ্গে আলাপ-আড্ডায় আবার মেতে উঠি। বড়ো আপার ফোন। বাবার সঙ্গে কথা বলতে চায়। কথা বলতে অনীহা প্রকাশ করেন বাবা। আপা কথা বলবেন। বাবার অস্পষ্ট কথাগুলো আপার বুঝতে সমস্যা হয়। অনুমানে বুঝতে পারছি, বাবা কিছুতেই জমি বিক্রি করতে রাজি না। বলছেন, দেখো, একদিন সবাই এই বাড়িতে এসে আশ্রয় নিবে। তখন আমাকে স্মরণ করবে। প্রতিটি ধুলা-বালি সাক্ষ্য দিবে আমার কষ্ট ও মেহনতে নির্মিত বাড়ির কথা। এটা হবে ঐক্যের প্রতীক। নষ্ট করা ঠিক হবে না। কেউ করতে চাইলেও ঠেকানো উচিত।

বাবা কখনও বলেনি তুমি কিন্ডার গার্টেনে থাকো অথবা চাকরি খুঁজে নাও। একদিন মেজো বোনের কথার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমি চাই না সব ছেলেমেয়ে চাকরি করুক। কেউ অন্তত বৃদ্ধ বয়সে আমার বিছানার পাশে থাকুক। গল্প করুক। আমার মাথায় হাত রাখুক। প্রয়োজনটা জেনে সহায়তা করুক। অভিজ্ঞতায় সে সমৃদ্ধ হোক। মৃত্যুর সময় পানির গ্লাস তুলে পিপাসা মিটাক। টাকা উপার্জন জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য হওয়া ঠিক নয়। পৃথিবীতে মানুষ মানুষের জন্যে। সন্তান কেনো বাবা-মায়ের জন্যে হবে না?

বাবার ইচ্ছে পূরণের জন্যে বাবা চায়নি চাকরি করি। আমাকে নিয়ে পরিবারের সবাই উদ্বিগ্ন থাকলেও বাবাকে উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি। এরপর বাবার প্রতি কিছুটা অভিমান বাড়ে। তুলনামূলক কথা বলি কম। কমে গেছে আড্ডা। যেখানে প্রাণ নেই সেখানে আড্ডা জমে না। বাবা কাছে ডেকে কথা বললেও প্রয়োজন ছাড়া তেমন কিছু বলিনি। অসুস্থ কিনা জানতে চান। সংক্ষিপ্তভাবে বলি, ঠিক আছি। তিনি আমাকে মায়ের কথা বলেন। শৈশবের কথা বলেন। জানি, বাবা আমাকে হাসাতে চান। কেনো জানি বাবার সঙ্গে বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারি না। তাছাড়া রাগ করেও লাভ নেই। মাস ছয়েক আগে সরকার নির্ধারিত চাকরির বয়স অতিক্রম করেছি। এই কারণেও আমার মন খারাপ থাকে। কিছু আবেদন করা আছে। সেগুলোই শেষ ভরসা। না হয় এই কিন্ডার গার্টেনেই থাকতে হবে। বাদ দিতে হবে গুলবদনের প্রেম ও ভালোবাসা।

০৪.

বাবা আগের চেয়ে বেশি অসুস্থ। খাওয়া-দাওয়া এক প্রকার বন্ধ। কথাও বলছেন না। বাবা কথা না বললে সব কিছু অসহ্য লাগে। ডাক্তার ভরসা রাখতে পারছেন না। একই সময় আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন মেজো আপা। জমি বিক্রি করে ব্যাংকে এফডিআর করতে বলেন। এরপর বিয়ে করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েও ভাবতে হবে। ভাগের অতিরিক্ত টাকা শখে ভাই-বোনরা বণ্টন নিতে চায়। সিরিয়াস আলোচনা চলছে। এক ফাঁকে বাবা চোখ মেলে তাকান। আবার চোখ বুঝেন। কিছুক্ষণ পর আবারও তাকান। সবাই তখন নীরব। বাবার দিকে তাকিয়ে আছি আমরা। হয়ত শেষ নসিহত করবেন ছেলেমেয়েদের। চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করেন বাবা। কাছে বসে চোখের পানি মুছে দেই। আবার চোখ বুজেন বাবা। উদ্বিগ্নতা বাড়ছে আমাদের। আমি চাই বাবা বেঁচে থাকুক। বাবার খেদমত করতে চাই। বাকি জীবন বাবার সেবা করে কাটিয়ে দেব। যে হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন আমাকে, এটা অন্তত বুঝি। না হয় কেনো আমাকে কাছে রাখতে

চাইবেন। তাছাড়া বাবাকে ছাড়া এখন ভালোও লাগে না। এখনও অনেক কিছু জানার আছে। প্রয়োজনে চাকরি করব না। ক্যারিয়ার লাগবে না। বাবা বেঁচে থাকুক। খাদেম হিসেবে থাকতে চাই আমি।

ঘণ্টাখানেক পর চোখ মেলেন বাবা। কাছে ডাকেন। কান্না কণ্ঠে বলেন, তোমাকে ঠকিয়েছি এমনটা মনে করো না। যেদিন আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব সেদিন তোমার চাকরি হবে। এর আগে না। আমার স্থায়ী-অস্থায়ী জায়গা-জমির বর্তমান বাজার দামটা হিসেব করো। প্রথম শ্রেণির একজন অফিসারের সমান বেতন ব্যাংকে এফডিআরে জমা আছে। ওটা তোমার নামে। উপস্থিত ভাইবোনের চোখ বড়ো হয়ে গেল! বাবা এত কিছু ভেবে রেখেছেন! সবাই টাকা নিতে অস্বীকার করল। বাবা বলেন, এই টাকায় তোমাদের কাছ থেকে বাড়িটি কিনে নিলাম। জীবনের পড়ন্ত বেলায় মুক্ত পরিবেশে আমার আশ্রয়ে কেউ এসে মাথা রাখবে। বাড়ি আমার নামে থাকবে।

বাবা প্রায় প্রতিদিনই যায় যায় অবস্থায়। বাড়িতে রোজ মানুষ আসে। আমার উপর কিছুটা চাপ কম, সেই ফাঁকে কিন্ডার গার্টেনে বাচ্চাদের পড়াতে যাই। বাচ্চাদেরকে ভালোবেসে ফেলেছি। তারাও আমাকে ভালোবেসেছে। যেই বন্ধন ত্যাগ করা কঠিন। বাবা একবার চেয়েছেন আমি কিন্ডার গার্টেনে আসি। ভাবছি কিছুদিন পর স্কুলের সঙ্গে কথা পাকাপাকি করব। বাবার ভালোবাসকে প্রাধান্য দিয়ে তাদেরকে বাংলাটা ভালোভাবে শেখাব। ভাষার বীজ ছোটো বাচ্চাদের অন্তরে রোপণ করব। যেনো বড়ো হয়ে সমস্ত পৃথিবীতে বাংলা ভাষার ফেরিওয়ালা হতে পারে। ভাইবোনদের ঘৃণা আমার উপর দিন দিন বাড়তে থাকে। কেনো আমি এমন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি! তারা কিছুতেই আমাকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেবেন না। বাবা ছিলেন বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনে সামনের সারির কর্মী। চোখের সামনে পুলিশের গুলিতে জীবন বিসর্জন দিয়েছে বন্ধুরা। আহত ও নিহত বন্ধুদের হাসপাতালে নিয়েও জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তখনই বাবার পণ ছিল বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাকে যে কোনো উপায়ে তুলে ধরবেন।

বাবা সংকটাপন্ন অবস্থায়। যে কোনো মুহূর্তে পড়তে হবে ইন্না নিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে নিতে পারিনি। বাবার থেকে নিষেধাজ্ঞা আছে। আমার মোবাইল বেজে উঠল। গুলবদনের ফোন। বাবার খবর জানতে চায়। এরপর আমার। বাবার পেছনে সময় দিয়ে তোমার ক্যারিয়ার নষ্ট করে দিয়েছ। তাই বলে- আমারটা তো আর নষ্ট করে দিতে পারি না। পরিবারের সিদ্ধান্তটা শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হলো। বিয়ে করতে যাচ্ছি। তোমার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। শুভ কামনায় থেকো। বাবার

দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। গুলবদনের কথায় মাথায় পড়ল বাজ। তবুও ছিলাম স্থির।

ইশারায় কাছে ডাকেন বাবা। বাকিদের বের হতে বলেন। বাবার চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। পানি মুছে দেই। শ্বাস একবার বাড়ে, একবার কমে। হাত-পায়ে নিস্তেজতা। আমার ভেতরে কম্পন বাড়ছে! আমার হাতের উপর বাবার মাথা। তাকিয়ে আছেন। চোখ নড়ছে না। চোখ বুজিয়ে দেই। এরপর আর চোখ মেলেননি। অথচ বাবা আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

বাড়ি জুড়ে ভয়ংকর নিস্তব্ধতা! কান্নার শব্দে বাড়িটি হয়ে গেছে বিষাদের বাগান। কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। ভেতরে ভেতরে সমুদ্রের দুই পাড়ে ভাঙন শুরু হয়েছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে। প্রবল উত্তাল সেই ঢেউ। দর্শক হয়ে দেখছি আর অশ্রু বিসর্জন করছি।

বাবার মৃত্যুর খবর শুনে দূর-দূরান্ত হতে জানাযায় মানুষের সমাগম বাড়ে। অধিকাংশই অচেনা। সামাজিক নিয়ম মেনে চতুর্থ দিনে আয়োজন করা হয় দোয়ার অনুষ্ঠান। কয়েকজন অপরিচিত মেহমানের উপস্থিতি দেখা মিলে। একজন ইশারায় কাছে ডাকেন। নাম জানতে চান, তাকে বলি, নাহিদ।

বলেন, তোমার বাবা যখন সরকারের আমলা ছিলেন তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ ছিলাম। বয়সে সিনিয়র হলেও আমরা বন্ধুর মতো। সংসার ও সংগ্রামী জীবনের অজানা অনেক কথা বলতেন। ভাষা সংগ্রাম ও ভাষার প্রতি তাঁর ছিল সীমাহীন প্রেম। চাইতেন অন্তত এক সন্তান শেষ বয়সে পাশে থাকুক। বাংলা ভাষায় চর্চা করুক। গবেষণার মাধ্যমে ভাষাকে সমৃদ্ধ করুক। তারজন্যে সব ব্যবস্থাও করে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোনো উপহার দিতে চাইলে সেটি গ্রহণ না করে বলতেন, খুশি হব ছোটো ছেলের জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করলে। এই হলো চাকরির কাগজপত্র। দ্রুত যোগদান করো। স্বাগতম।♦

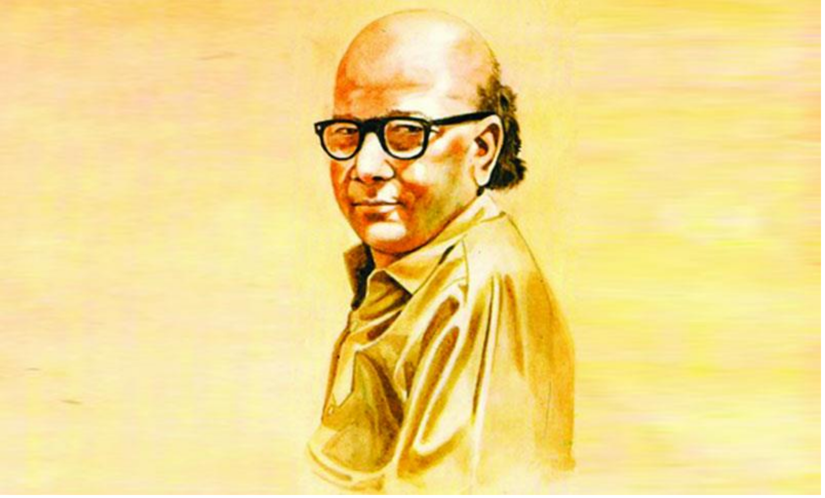

১১ ফেব্রুয়ারি বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী'র মৃত্যুবার্ষিকী

সৈয়দ মুজতবা আলী

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ধ্রুপদী লেখক

মঈনুল হক চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনিবার্য শাখা হলো ভ্রমণসাহিত্য। বাংলার কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই ভ্রমণসাহিত্য রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম সৈয়দ মুজতবা আলী। তিনি ১৯০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সিলেটের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ সিকান্দর আলী ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার। পিতার বদলির চাকরি হওয়ায় মুজতবা আলীর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন কাটে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ১৯২১ সালে তিনি শান্তি নিকেতনে ভর্তি হন। বিশ্বভারতীর প্রথম দিকের ছাত্র ছিলেন তিনি। সেখানে তিনি সংস্কৃত,

ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, হিন্দি, গুজরাটি, ফরাসি, জার্মান ও ইতালীয় ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বিশ্বভারতী থেকেই ১৯২৬ সালে স্নাতক পাস করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৩২সালে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে গবেষণার জন্য তিনি ডিফিল ডিগ্রি লাভ করেন। উল্লেখ্য, শান্তি নিকেতনে পড়ার সময় সেখানকার বিশ্বভারতী নামের হস্তলিখিত ম্যাগাজিনে মুজতবা আলী লিখতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি 'সত্যপীর', 'ওমর খৈয়াম', 'টেকচাঁদ', 'প্রিয়দর্শী' প্রভৃতি ছদ্মনামে দেশ, আনন্দবাজার, বসুমতী, সত্যযুগ, মোহাম্মদীসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লেখেন। তিনি বহু দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন ভ্রমণকাহিনি। এই ভ্রমণকাহিনির জন্য তিনি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। এছাড়া তিনি ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনাও লিখেছেন। বিবিধ ভাষা থেকে শ্লোক ও রূপকের যথার্থ ব্যবহার, হাস্যরস সৃষ্টিতে পারদর্শিতা এবং এর মধ্য দিয়ে গভীর জীবনবোধ ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন একজন প্রতিভাধর মানুষ। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমাত্রিক। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর প্রতিভা সর্বজন বিদিত। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতার পাশাপাশি তিনি বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য রচনাশৈলীর প্রবর্তক তিনি। সৈয়দী ঢং নামে একে অনেকেই চেনেন।

এই গুণের জন্য কেউ কেউ তাঁকে রম্য লেখক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করতে চান। কিন্তু তিনি শুধু রম্যলেখক নন। শুধু সাহিত্যিকও নন। তিনি শিক্ষাবিদ, গণমাধ্যম শিল্পী এমন কি বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের এক মহাদার্শনিক ছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদ চিন্তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পার্থক্য ছিল না। সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাশৈলী অসাধারণ। একথা শাব্দিক অর্থেই। কারণ তাঁর মতো বর্ণনাভঙ্গি আর কোনো ভ্রমণকাহিনীতে পাওয়া যায় না। নিজস্ব রচনাভঙ্গিতে তিনি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পরিপার্শ্বের দৃশ্যমান জগত থেকে যা তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেন, সেসব প্রসঙ্গও অন্যদের রচনায় দুর্লভ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভ্রমণসাহিত্যের পরিমাণ কম নয়। কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলী ভ্রমণসাহিত্যের ভিন্ন এক ভাষা ভিন্ন এক গড়ন তৈরি করেন, যার সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরিদের সম্পর্ক অতি সামান্য মজলিশি আড্ডার আবহে কীভাবে বিচিত্র জীবন জগৎ রসসিক্ত করে উপস্থাপন করা যায়, তার এক জাদুকরী প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। ভ্রমণ সাহিত্য যে মূলত মানুষের সাহিত্য সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা পড়লেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি পাহাড় দেখেন না, মানুষ দেখেন, তাঁর কাছে পাহাড় বা গিরিখাত গুরুত্বহীন যদি না তাতে মানুষ থাকে। মুজতবা আলী দাবি করেছেন, শুধু ভ্রমণের আনন্দ উপভোগের জন্য কখনো বাড়ি

ছেড়ে বের হননি। যেটুকু গেছেন তা দায়ে পড়ে। কথার মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে। কিন্তু উসিলা যা-ই থাকুক তাঁর রক্তে যে ভ্রমণের নেশা-সেটা তিনি গোপন করবেন কিভাবে। সেসব অভিজ্ঞতাই এসেছে তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যে। আনন্দের ভাগ থেকে পাঠককেও বঞ্চিত করেননি তিনি।

তাঁর রচনাবলির প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভ্রমণ বিবরণ। তবে

নির্ভেজাল ভ্রমণ সাহিত্যের বই দেশে-বিদেশে, জলে-ডাঙায়, চাচা কাহিনী, মুসাফির প্রভৃতি। উল্লেখ্য, সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা প্রথম বইটিই ছিল 'দেশে-বিদেশে'। এটি ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায়। ফলে ভ্রমণ কাহিনি দিয়েই মুজতবা আলী বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসনটি পাকা করে নিয়েছিলেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম গ্রন্থ 'দেশে-বিদেশে' বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের এক অভিনব সংযোজন। এই বইটির মাধ্যমে তিনি যে রচনাশৈলী প্রবর্তন করেন, তা আজো পাঠককে ধরে রেখেছে। কী আছে এই বইটিতে? দুই খণ্ডে প্রকাশিত দেশে বিদেশের প্রথম খণ্ড হচ্ছে কলকাতা থেকে রেলপথে কাবুল যাত্রার এক চমৎকার বিবরণ। ট্রাভেলসের ভঙ্গিতে লেখক সেখানে তুলে ধরেছেন তাঁর যাত্রাপথের সঙ্গী বিচিত্র সব চরিত্র, যারা একই সঙ্গে অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ, মানবিকতায় দৃষ্টান্ত, আবার আনন্দ দানে সক্ষম। চলার পথে তিনি যেসব এলাকা অতিক্রম করেন সেসব অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, পোশাক-আশাক, সংস্কৃতি, কৌতুকবোধ কোনো কিছুই তাঁর সরস কলমে বাদ পড়েনি। শুরু হয়েছে কলকাতার ফিরিঙ্গি সহযাত্রীকে নিয়ে। পরে তা বিস্তৃত

হয়েছে পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে, বিশেষ করে পাঞ্জাব ও পেশোয়ারের পথের শিখ সর্দারজি ও পাঠান সহযাত্রীদের কথা। দ্বিতীয় খণ্ড অন্যরকম। প্রথম খণ্ড পড়ে যারা ধারণা করবেন 'দেশে-বিদেশে' হচ্ছে একটি ভ্রমণকাহিনি, দ্বিতীয় খণ্ডে তাদের হোঁচট খেতে হবে। সেখানে কিন্তু কোনো ভ্রমণবৃত্তান্ত নেই। আছে লেখকের নতুন কর্মস্থল আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা। সেখানকার প্রগতিশীল শাসক আমানুল্লাহর আধুনিক আফগানিস্তান গঠনের স্বপ্ন, মোল্লাতন্ত্রের বিরোধিতা, প্রতিবিপ্লবে আমানুল্লাহর পতন তথা আফগানিস্তানের উত্থান-পতনের বিবরণ। তিনি কাবুলে মানুষের সহজ সরল জীবনযাত্রা, চলন-বলন, খাওয়া-দাওয়ায় যে ঐতিহ্য- সব কিছুই নিপুণ শিল্পীর মতো তুলে ধরেছেন। 'দেশে-বিদেশে' কোনো বাস্তব বিবর্জিত কাহিনি নয়। এটা লেখকের আফগানিস্তানবাসীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯২৭ সালে আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগে চাকরি লাভ করেন। কাবুলের কৃষি বিজ্ঞান কলেজে মাসিক দু'শ' টাকা বেতনে ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার প্রভাষক নিযুক্ত হন। বছর না যেতেই কাবুলের শিক্ষা বিভাগ মুজতবা আলীর জার্মান ভাষায় গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁর বেতন বাড়িয়ে তিনশ' টাকা করেন। এতে পাঞ্জাবী শিক্ষকরা ঈর্ষাকাতর হয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলেন, সৈয়দ মুজতবা আলীর ডিগ্রি হচ্ছে বিশ্বভারতীর। সেটা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আপনাদের সনদে পাঞ্জাব গভর্নরের দস্তখত আছে। আমাদের এই ক্ষুদ্ররাষ্ট্রেও গভর্নরের অভাব নেই। কিন্তু মুজতবা আলীর সনদে দস্তখত করেছেন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর তিনি পৃথিবীর কাছে সারা প্রাচ্য দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তবে আফগানিস্তানের পটভূমিতে শুধু দুই খণ্ড 'দেশে-বিদেশে' নয়, 'শবনমের' মতো কালজয়ী উপন্যাসও লিখেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। তাঁর বিভিন্ন রচনায় ঘুরেফিরে এসেছে আফগানিস্তানের প্রসঙ্গ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এই অভিজ্ঞতা প্রকাশে তিনি সময় নিয়েছেন অনেক বেশি। কিশোর বয়সে হাতে লেখা 'কুইনিন' পত্রিকার মাধ্যমে যার সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি, তিনি পরিণত বয়সে রীতিমতো গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর আগে তাঁর যে পাঁচটি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলো ঠিক মুজতবা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করেন না। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়ার পরও মুজতবা আলী সাহিত্যচর্চার ব্যাপারে কিছুটা কুণ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'দেশে-বিদেশে' প্রকাশিত হয় এবং সাহিত্যাঙ্গনে তিনি এই বইটি দিয়েই অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার কারণে 'দেশে-বিদেশে'র একটি প্রামাণ্য মূল্যও আছে। তবে লেখক একে সন তারিখ দিয়ে তথ্য

ভারাক্রান্ত করতে চাননি। সন তারিখ না দিয়ে তিনি একে প্রতীকী করে তোলার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। দেশ, সমাজ ও মানুষের বিবরণ এলেও এর কাহিনি হয়ে গেছে কালনিরপেক্ষ। তবে এতে রস ক্ষুণ্ন না হয়ে আরো বেড়েই গেছে বলা চলে। তাঁর ভাষায় বৈদগ্ধ্য আছে, পাণ্ডিত্য আছে। কিন্তু সেটা অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করে না। সে কারণে সাধারণ গল্প-উপন্যাস যখন পাঠকের কাছে একঘেঁয়ে মনে হচ্ছিল তখন এ রকম রম্য বর্ণনায় তত্ত্বকথা ও ভ্রমণের আনন্দ পেয়ে পাঠক বইটি লুফে নেয়।

দেশে-বিদেশে'র মধ্যে লেখক কখনো সিলেটি, কখনো বাঙালি, কখনো ভারতীয় আবার কখনো বিশ্ব নাগরিক। হাস্যরস আর বিদ্রূপ দুটোর মিশ্রণে তৈরি হয়েছে তাঁর মজলিশি ভাষা। 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থের অনেক চরিত্র তাদের আত্মমহিমায় পাঠকের হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মৌলভী জিয়াউদ্দীন। কাবুলে তিনি মুজতবা আলীর সহকর্মী ছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ এতটাই ব্যথিত হয়েছিলেন যে, তাঁর জন্য তিনি একটি মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেছিলেন। **সৈয়দ** মুজতবা আলী সেই কবিতা বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে তাঁর গ্রন্থে সংযুক্ত করেছেন। মনে পড়ে সেই কাবুলী মহিলার কথা। যিনি নিঃসঙ্গ লেখককে দেখে স্নেহশীলা হয়ে তার স্বামীকে বলেছিলেন, 'বাচ্চা গমমী খুরদ' অর্থাৎ ছেলেটির মনে সুখ নেই। তবে সব চরিত্রকে ছাপিয়ে উঠেছে লেখকের গৃহভৃত্য আবদুর রহমান। তার সরলতা ও সেবাপরায়ণতা পাঠকের হৃদয়কেও জয় করে নেবে। গ্রন্থের শেষে লেখক এই আবদুর রহমানের চেহারাই এনেছেন। তার বর্ণনায়, 'মনে হলো চর্তুদিকে বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হৃদয়।' উল্লেখ্য, সাগরময় ঘোষের উৎসাহে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পরপরই সেটা বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পায়। রচনাটি বই আকারে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে পাঠকরা চিঠি লিখতে শুরু করেন। শেষে নিউ এজ পাবলিশার্স থেকে ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। তবে বইটির প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম মুদ্রিত হয়েছিল ড. সৈয়দ মুজতবা আলী। কিন্তু অচিরেই তিনি তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতিকে বেশি গুরুত্ব দিতে ডক্টরেটের ভার মুক্ত হন। সৈয়দ মুজতবা আলীর সবচেয়ে বড় অবদান বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের দার্শনিক চিন্তা। স্কুল জীবনেই তিনি স্বাধিকার চেতনা থেকে সরকারি স্কুল বর্জন করেছিলেন। বিপদে ফেলেছিলেন তাঁর সরকারি চাকরিজীবী পিতাকে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশ মাতৃকার মুক্তির কথা ভেবেছেন বারবার। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এসেছে সে কথা। যেমন, ছোট গল্পে লিখেছেন- পণ্ডিত মশাই তাঁর

ছাত্রদের কাছে প্রশ্ন করেছেন। বিলিতি সাহেবের ৩ পা অলা কুকুরের পেছনে যে টাকা খরচ হয় প্রতি মাসে, শিক্ষকের বেতন তাঁর ৩ভাগের এক ভাগ। তাঁর মানে দেশী শিক্ষকের পরিবার ওই কুকুরের ১টা পায়ের সমান। দেশ ভাগের মাত্র ৩মাসের মাথায় তিনি সিলেটে এসে ঘোষণা করলেন বাংলাকেই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। এ নিয়ে পাকিস্তান আমলে সরকারি দমন নিপীড়নের শিকার হতে হলো। বাধ্য হয়ে তিনি চলে গেলেন ভারতে। সেখানে তিনি বাঙালির জাতীয়তাবাদ ও মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে লেখালেখি করেন। অভিশপ্ত দেশভাগের সবচেয়ে নিষ্ঠুর কুরবানি মেনে নিয়েছিলেন তিনি। তিনি একা ছিলেন ভারতে, আর তার পরিবারের সকল সদস্য পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর পরিবারের অনেক সদস্য তারই অনুপ্রেরণায় সক্রিয় ভাবে অংশ নেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর মোট বইয়ের সংখ্যা ৩০টি। এর মধ্যে ভ্রমণকাহিনি : দেশে বিদেশে, জলে ডাঙায়, উপন্যাস ঃ অবিশ্বাস্য, শবনম, ছোটগল্প, চাচাকাহিনী, টুনি মেম, রম্যরচনা : পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, গল্পমালা, রাজা-উজির, ধূপছায়া, বেঁচে থাক সর্দি-কাশি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের জন্য তিনি ১৯৪৯ সালে 'নরসিংহ দাস পুরস্কার', ১৯৬১ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' এবং মৃত্যুর পর ২০05 সালে একুশে পদক লাভ করেন। ভ্রমণকাহিনি পড়তে যারা পছন্দ করেন, বইয়ের পাতার ডানায় চড়ে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন এমন পাঠকের সৈয়দ মুজতবা আলীকে ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যকে চিনতে হলে নতুন প্রজন্মের পাঠকের কাছে এখনও তাঁর বইপাঠ শুধু প্রয়োজনীয় নয় গুরুত্বপূর্ণও বটে। ১৯৭৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ধ্রুপদী লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।♦

শ্র | দ্ধা | ঞ্জ | লি

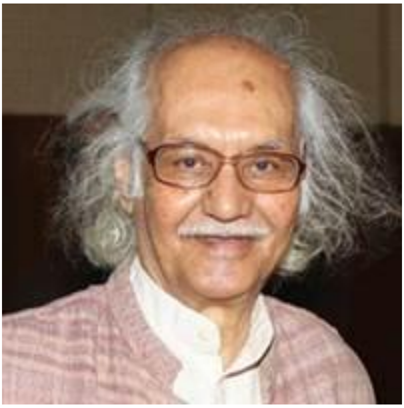

জন্ম : ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ সাল

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী

জাতীয় মননের বাতিঘর

গাজী সাইফুল ইসলাম

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ছিলেন জাতীয় মননের বাতিঘর। হ্যাঁ, জাতি, দেশ ও দেশের মানুষকে মননশীলতা দেবার জন্য তাঁর মত বাতিঘরের প্রয়োজন এখনও অনেক বেশি। বট বৃক্ষের মত মানুষ, যাকে তাকে নির্বিচারে আশ্রয় প্রশ্রয় দিতে ভীষণ অকৃপণ ছিলেন তিনি। তাঁর চলে যাওয়ার পরও বহুবার নয়াপল্টনের গাজী ভবনের সামনে দিয়ে যাবার সময় ভুল করে থমকে দাঁড়িয়েছি। ইচ্ছে করেছে, নিচে রিসিপশনে গিয়ে ফোন দিই, স্যারের সঙ্গে দেখা করে যাই, নতুন কী বই বেরিয়েছে জেনে যাই।

''কিন্তু হায়, তাঁর মত কেউ ডাকে না আমায়
কেউ বলে না, এগিয়ে যাও
সামনে বিস্তৃর্ণ ভুবনজোড়া পাঠশালা ডাকছে তোমায়।
ওখানে নেই দলাদলি, স্বার্থের চুলছেড়া বিশ্লেষণ
আছে মানুষে, জ্ঞান-প্রজ্ঞা লাভের তাড়না অণুক্ষণ।''

কত সময়ে অসময়ে উল্লিখিত ভবনের সাততলায় গিয়ে হাজির হয়েছি। কখনও মুখ ম্লান করতে দেখেনি। নতুন কোনো বই হলে অনেক সময় তিনিই বলতেন, নিয়ে যাও। আমি তাঁর বইয়ের আলোচনা/পরিচিতি লিখতাম। যত দিয়েছেন আলোচনা করেছি তার তিনভাগের একভাগ কিংবা তারও কম। কিন্তু কোনোদিন প্রশ্ন করেননি। শুধু দিয়েই গেছেন। যে সব আলোচনা (যেমন দৈনিক আজকের কাগজ, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, মাসিক সাঁকো) ছাপা হতো কাগজ পৌঁছে দিতাম। তিনি খুশি হতেন, তৎক্ষণাৎ সেটা পড়তেন। ভালো লাগার কথা জানাতেন। সত্য বলতে, তখন তাঁর মুখে একটি হাসির রেখা ফুটে উঠত, দেখে আমার ছোট্ট বুকটা ভরে যেত। কারণ তিনি শুধু অনুবাদক নন, তিনি আমার প্রিয় আনন্দমোহন কলেজের সাবেক একজন অধ্যক্ষ। তাঁর মত এমন উদার, বড় মনের কম মানুষের সাহচার্য পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি বলতেন: 'মৌলিকই বেশি লিখবে। কিন্তু যখন আর কলম এগুবে না অনুবাদ করবে। আনন্দের জন্য, শেখার জন্য।''

একবার একটি দৈনিক পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় তিনি একটি বড় লেখা দিলেন। পত্রিকাটি তার চিন্তা-চেতনার সঙ্গে যায় না। আমি বেয়াদবের মত শক্ত করে বললাম: 'স্যার, আপনি এটা কেন করলেন? এটা করতে পারি আমরা তরুণরা, দুটো পয়সার জন্য কিংবা স্রেফ লেখা ছাপার জন্য। আপনার তো সে সমস্যা নেই।'

স্যার বললেন: 'আরও একজন এমন অভিযোগ করেছে। দেখো আমিও দিতে চাইনি, কিন্তু অমুক ছেলেটি এমনভাবে ধরল, না বলতে পারিনি।'

কী বলব, স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। যার মন আকাশের মত, তিনি তারই দেশের একটি ছেলের আবদার রক্ষা না করে পারেন কীভাবে? তিনি তো আমার মত ছোট মানুষ নন।

আরেকবার খালেদ হোসাইনির 'কাইট রানার' বইটি বেরিয়েছে। বিশ্বসাহিত্যাঙ্গনে আলোচনার ঝড় বইছে। আমি বইটি কিনে নিয়ে গেলাম স্যারের বাসায়। বললাম, স্যার, এ বইটিতে আমি আপনার সহ-অনুবাদক হতে চাই। তিনি বইটি উল্টেপাল্টে দেখলেন। এরপর বললেন: 'খুবই ভালো বই। আমি চাই, অনুবাদটি তুমিই করো। যত সহযোগিতা লাগে আমি করব।' 'কাইট রানার' আমি অনুবাদ করতে পারিনি। দু'তিন বছর পর স্যারের অনুবাদে 'কাইট রানার' বেরুলো। বাসায় গেলাম। স্যার বইটি হাতে দিয়ে বললেন: 'তোমার অনুবাদের অপেক্ষায় ছিলাম। করলে না কেনো?' আমার সাংসারিক সমস্যার কথা

জানালাম। বললাম: 'বড় কাজ করার জন্য বড় সময় দরকার। আমি সময় বের করতে পারলাম না স্যার।'

কী বলব, তাঁর বড়ত্বের সামনে আমি যে কত ছোট, এটা কোনোভাবেই ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

বিশ্বের ৮৫ ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি বইটির (অ্যাডর্ন-২০০৮) ফ্ল্যাপের জন্য লেখা দরকার। তিনি জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন। খাতা-কলম নিয়ে হাজির হলাম। তাৎক্ষণিক লিখে দিলেন। বললেন না, পরে এসো। একজন অনুবাদক হিসেবে যখন তার অনূদিত বই পড়ি, বিস্ময়ে হতবাক হই। এত ধৈর্য তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন। কত বিশাল কলেবরের বই রিচার্ড রাইটের 'ব্লাক বয়', 'নেটিভ সান', ওরহান পামুকের 'তুষার', খালেদ হোসাইনির 'কাইট রানার', গেব্রিয়েল গর্সিয়া মার্কেজের 'প্রেম ও কলেরা', বেউলফ ইত্যাদি তিনি অবলীলায় অনুবাদ করে গেছেন। জীবনের শেষ ক'বছর বুকে পেসম্যাকার লাগানো ছিল। শরীর অসুস্থ ক্লান্ত ছিল কিন্তু মন অসুস্থ ক্লান্ত হয়নি একদিনের জন্যও। একবার আমি বাসায় গেলাম তিনি লেখার টেবিল থেকে উঠে এলেন। মনে হলো আমার জন্য লেখার ছন্দে পতন ঘটল। বললাম: 'স্যার, আপনার কাহিল লাগে না?' হেসে বললেন: 'কাহিল লাগলেও টেবিলে না বসে পারি না। কেমন যেন চাপ থাকে যতক্ষণ চলমান কাজটা শেষ না হয়। আসলে বড় বইয়ের অনুবাদের সময় আমার মধ্যেও এক ধরনের সৃজনশীল চিন্তা কাজ করে, ফলে দরদ দিয়ে কাজটি করি। এতে তৃপ্তি পাই।'

সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বিনয়ের সঙ্গে ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে যত প্রশ্ন করেছি, তিনি কিছু মনে করেননি। হেসেছেন। অধিক বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন। অপ্রাসঙ্গিক একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। একবার একটি সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করলাম: অনুবাদককর্মকে বিশেষ করে বেছে নিলেন কেন? আপনারই অনুজ মুনীর চৌধুরী তো মৌলিক রচনায় তখনই তারকাখ্যাতি পেয়েছিলেন।

তিনি বললেন: 'সৃজনশীল সাহিত্য কর্মের জন্য একটি বিশেষ মন থাকা দরকার, প্রতিভা থাকা দরকার। যা মুনীর চৌধুরীর ছিল। আমার ছিল না। আমার মধ্যে তেমন শক্তি বা প্রতিভা রয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে আমি অনুভব করিনি।...' এ উত্তর থেকেই বোঝা যায় তিনি কতটা বিনয়ী ছিলেন। নিজের সম্পর্কে তাঁর মত আমি মানতে পারিনি। তর্ক শুরু করেছি: 'আমি মানতে নারাজ আপনার প্রতিভা নেই। লেখা শুরু করলে আপনি সবকিছু লিখতে পারতেন। সবই হতে পারত আপনার হাত দিয়ে। কিন্তু আপনি অলসতা করেছেন, অথবা অনুবাদের বিশাল মজা থেকে বেরুতে পারেননি কিংবা চাননি।'

-'সত্যিই বলেছ সাইফুল'। বিনয়ী শিক্ষার্থীর মত তিনি বলছেন: 'আসলে ওভাবে চেষ্টা করা হয়নি। কিংবা বলা যায়, অনুবাদ আমায় মৌলিক রচনার দিকে এগোতে দেয়নি। তবে অনুবাদ করেও আমি খুশি। আমার মেয়েটা একটার পর একটা বই বিদেশ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে, অনুবাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমিও ছাড়তে পারিনি। এভাবেই সময় চলে গেছে। নিজের কথা প্রায় কিছুই লেখা হয়নি। তো এখন কথা দিচ্ছি, এখন থেকে লিখতে চেষ্টা করব।' স্যার কথা রেখেছিলেন। তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রথম কবিতা দিয়েছিলেন আমার 'দার্শনিক' এর জন্য। বইও বেরিয়েছিল: 'কবীরের অকবিতা' নামে।

কবীর চৌধরী বহু তরুণের জন্য এখনও প্রেরণাশক্তির উৎস। তাঁর জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করতে যেয়ে আমার কত কথাই না মনে পড়ছে। তিনি একাধারে শিক্ষক, উৎসাহী সংগঠক, জাতীয় অধ্যাপক, জাতীয় বিষয় আশয়ের পরামর্শক। কিন্তু বাংলাভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদানের কারণে তিনি যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর মত এত অনুবাদ আর কেউ করতে পারেননি। তাঁর অনুবাদের সংখ্যা রীতিমত ঈর্ষাজাগানিয়া। আমার একটি প্রশ্ন ছিল: এত আত্মশক্তি আপনি কোথায় পান। তিনি বলেছিলেন: 'পাঠ থেকে, ভালোবাসা থেকে। দায়িত্ববোধ থেকে। আমি সারাজীবন যা করতে চেয়েছি তাই করে গেছি ক্লান্তির কাছে হার না মেনে।'

সত্যিই তো। আমি দেখেছি, তিনি ছিলেন পুরো আস্তিক একজন মানুষ। একবার দেশের বাইরে অসুস্থ মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি বললেন: 'পরম করুণাময়ের কৃপায় আমার মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠেছে।' এ কথা তাঁর কোনো একটি বইয়ের ভূমিকাতেও আছে।

বড় মানুষেরা তাঁদের জীবনের পাঠ শৈশবেই পেয়ে যান। পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ ও পারিপর্শ্বিকতা থেকে। কবীর চৌধুরীও পেয়েছিলেন। ২৯ জুন ১৯৯০-এ দৈনিক বাংলায় ছাপা হওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন: ১৯২০ এর দশকের শেষ ও ৩০ এর দশকের গোড়ার দিকে তরুণসমাজে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা জেগে উঠতে শুরু করেছিল। শিশু হলেও আমরা তার আঁচ কিছুটা অনুভব করছিলাম। বগুড়াতে আমাদের বাসার কাছে শিশু কিশোরদের একটা ক্লাব ছিল। সেখানে আমরা ব্যায়াম করতাম, কাঠের ছোরা দিয়ে ছোরা খেলা শিখতাম। সে সময় বড়দের শ্রদ্ধা দেখানো ছিল একটি সহজাত ব্যাপার। সময় মেনে চলা, কথা দিয়ে কথা রাখা, আদর্শের প্রতি অনুগত থাকা, সেদিনের সমাজ জীবনে মোটামুটি বাস্তব সত্য ছিল। বিত্তের পেছনে মানুষ আজকের মত সকল ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে এমন হন্যে হয়ে ছুটত না। শৈশবের ওই পারিপার্শ্বিক জীবনধারা ও

মূল্যবোধ আমার মধ্যেও তার ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। হয়তো অবচেতনেই।’

আসলে সময়ও বড় মানুষদের তৈরি করে। ১৯২০ থেকে ১৯৫২-১৯৭১ উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে উত্তাল সময়। কবীর চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন উপমহাদেশীয় চেতনা জাগরণের উন্মেষকাল ১৯২৩ সালের ০৯ ফেব্রুয়ারি। যদিও তাঁর জন্মস্থান ব্রাহ্মণব্রাড়িয়া কিন্তু তাঁর পৈত্রিক নিবাস নোয়াখালির চাটখিল উপজেলার গোপাইরবাগ গ্রামের মুন্সী বাড়ি। পিতা খান বাহাদুর আব্দুল হালিম আর মা আফিয়া বেগমের প্রথম সন্তান তিনি। তাঁর পুরো নাম ছিল আবুল কালাম মোহাম্মদ কবীর। ১৯৩৮ সালে তিনি ঢাকা কলিজিয়েট থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। সে সময় তিনি বোর্ডে সপ্তমস্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে ও ১৯৪৪ সালে এম.এ.তে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। এরপর ১৯৫৭-৫৮ সালে ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে চলে যান আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে পড়েন মার্কিন সাহিত্য বিষয়ে। এরপর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকপ্রশাসন সম্পর্কে উচ্চতর ডিগ্রি নেন। সুসাহিত্যিক, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক কবীর চৌধুরী দেশের বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপনা শেষে অবসর নেন অধ্যাপনা জীবন থেকে। ১৯৯৮ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক পদটি অলঙ্কৃত করেন। ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি ও ১৯৯১ সালে একুশে পদক পান। এ ছাড়াও কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বহু পুরস্কার ও সম্মাননা তিনি জীবিতাবস্থাতেই লাভ করেছেন।

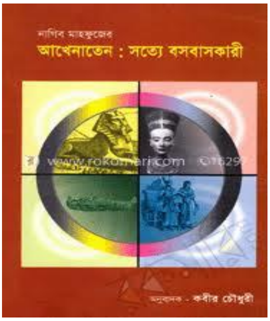

জনাব কবীর চৌধুরীর সম্মানে তাঁর অনূদিত নাগিব মাহফুজের উপন্যাস ‘আখেনাতেন : ডয়েলার ইন ট্রুথ’ বইটির আলোচনা আমরা এখানে যুক্ত করলাম

নাগিব মাহফুজ নোবেল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৮) বিজয়ী ঔপন্যাসিক। তাঁর রচিত সেরা উপন্যাসগুলোর মধ্যে আখেনাতেনঃ ডয়েলার ইন ট্রুথ-এর স্থান তিন-চার নাম্বারে। কবীর চোধুরী এটির অনুবাদ করেছেন আখেনাতেনঃ সত্যে বসবাসকারী নামে। উপন্যাসটির একটি বিশেষত হলো, এর রচনা শৈলী। ১৪৪ পৃষ্ঠার এ উপন্যাস জুড়ে শুধু একজন লোক সম্পর্কেই প্রশ্ন করে গেছেন সত্যানুসন্ধানী মেরিয়ামুন। মেরিয়ামুন আসলে এ উপন্যাসের কথক। এ উপন্যাসের কোনো চরিত্রই সরাসরি গল্পে অংশগ্রহণ করে না। মূল চরিত্র খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের ফারাও সম্রাট আখেনাতেন, যিনি ফারাও সম্রাট তৃতীয় আমেনহোতেপের দ্বিতীয় পুত্র। সম্রাটের প্রথম পুত্রের মৃত্যু হলে তিনি রাজ্যের সম্রাট হওয়ার উত্তরাধিকারী হন। উপন্যাসটিতে তাকেই আমরা পেয়েছি নায়ক হিসেবে। তাঁর সম্পর্কে অপরাপর চরিত্রগুলোর বক্তব্যই হলো এ উপন্যাসের টোটাল বক্তব্য। নিজেদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার মতো তারা এক একজন এক এক রকম কথা বলেছেন। আর তাদের বক্তব্য থেকেই আমারা বুঝতে পারি কে কতটা সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। কার চরিত্র কেমন।

উপন্যাসটির মূল কাহিনী এরূপঃ সম্রাট আখেনাতেন তার ছেলে বেলা থেকেই ভিন্ন প্রকৃতির। রাজ-রাজাদের যে অহঙ্কারী ভোগ-বিলাসি লাম্পট্যপূর্ণ চরিত্র থাকে, আখেনাতেন তেমন না। তিনি বরং তাদের বিপরীত। প্রাচীন রাজসভাগুলোতে জড়ো হওয়া চাটুকারদের তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সাধারণ মানুষেরা যে রাজা এবং রাজার লোকদের দ্বারা নানান কারণে অহরহ নির্যাতিত হতো তিনি ছিলেন এমন নির্যাতনের ঘোর বিরোধী। বিশেষ করে ফারাও রাজারা নিজেদের শুধু রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতিই ভাবতেন না তারা নিজেদের দেবতার সবচেয়ে অনুগ্রহভাজন সেবকও ভাবতেন। আর রাষ্ট্রের পোষা পুরোহিততন্ত্র সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করত নিজেদের স্বার্থে। আখেনাতেন ক্ষমতায় আসার আগেই এসব অনাচারের বিরুদ্ধে লড়ার মানসিকতা লাভ করেন। এমনই একদিন তিনি এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ডাক শুনতে পান। এবং ক্ষমতা গ্রহণের পর পিতৃপুরুষদের বহু বছরের লালিত দেবতাতন্ত্রের পথ পরিহার করে একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার শুরু করেন। এতে তাকে অবিশ্বাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে রাজ্যের সুবিধাভোগী, অত্যাচারি একটা শ্রেণী, যদিও বেশিরভাগ মানুষ তাকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করল। কিন্তু সম্রাট শুধু তার নিজের ধর্মই প্রচার করলেন না তিনি সব শাস্তির বিধান বিলোপ ঘোষণা করলেন। একই সঙ্গে সব রকম রক্তপাত বন্ধের নির্দেশও দান করলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, শাস্তি নয় ভালোবাসা দিয়েই জয় করতে হবে সব রকম প্রতিকূলতা, হিংসা আর শত্রুতা। কিন্তু সম্রাটের

শেষের সিদ্ধান্তগুলো ছিল ভুল। ওসবের সঙ্গে আরও দু'টি ভুল যোগ হলো, যখন তিনি সকল ধর্মের স্বাধীনতা খর্ব করলেন। মন্দিরগুলো বন্ধ করে দিলেন। অবশ্য মন্দির থেকে বাজেয়াপ্ত করা সকল অর্থ-সম্পদ তিনি দেশের গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। সম্রাটের এ রকম শাস্তি বিলোপ নীতি গ্রহণের সুযোগে ক্ষমতালোভী দুষ্টুলোকেরা দ্রুত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠল। তারা সংবদ্ধ হয়ে রাজার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলো। তারা রাজাকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করল। এভাবেই চতুর্থ ফারাও সম্রাট আখেনাতেনের রাজত্বে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো যা শেষত রূপ নিলো গৃহযুদ্ধের। প্রাসাদে বন্দী হলেন আখেনাতেন। তাঁর স্ত্রী নেফারতিতি তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। এভাবে ক'বছর বন্দি থাকার পর ক্ষমতাসীনরা ঘোষণা করল যে, সম্রাট আখেনাতেনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করল না। তারা ধরে নিলো, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। যদিও লোক চক্ষুর অন্তরালে সমাহিত করা হলো তাঁকে, দেয়া হলো রাষ্ট্রীয় মর্যাদা।

উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মেরিয়ামুন পনেরো জন লোকের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিমত নিরপেক্ষভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ পনেরো জনের মধ্যে কেউ আখেনাতেনের ছেলেবেলার বন্ধু (কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাজকর্মচারী), কেউ শিক্ষাগুরু (এবং পরে রাজনৈতিক উপদেষ্টা), কেউ মাতৃতুল্য নারী, কেউ মন্ত্রী, কেউ সেনাবাহিনীর প্রধান। কেউ আবার পুলিশের প্রধান থেকে চাকরিচ্যুৎ। কিন্তু তারা সকলেই বিভিন্ন সময় কোনো না কোনো যুগসূত্রে আখেনাতেনের খুব কাছাকাছি ছিলেন।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এ সব লোকেরাই আখেনাতেন সম্পর্কে অসংখ্য পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রদান করল। একজনের বক্তব্যের সঙ্গে আরেকজনের বক্তব্য খুব একটা মিলে না। একটু আগে একজন হয়তো বললেন, তাঁর চেহারায় একটা মেয়েলি দুর্বলতার ছাপ দেখা গেলেও দুর্বল চিত্তের মানুষ তিনি ছিলেন না। প্রচলিত পুরোহিততন্ত্রকে ভণ্ডামি আখ্যায়িত করে তিনি একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু কিছু ভুলের কারণে তিনি সফল হতে পারেননি। তিনিই প্রথম ফারাও সম্রাট যিনি সিংহাসন থেকে মাটিতে নেমে এসেছিলেন, মানুষের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন রাজসভাকে। তিনিই মানুষে মানুষে সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শাস্তি দানের নীতি বাতিল করে ভালোবাসার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই হয়তো আরেকজন বলল, আখেনাতেন ছিলেন ভণ্ড, ফারাওদের উত্তারাধিকারী হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি নিজের দুর্বলতা লুকোতে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধর্ম প্রচারের নামে সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছেন।

এমনই পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায় আখেনাতেনের সুন্দরী স্ত্রী নেফারতিতি সম্পর্কেও। সারা উপন্যাসে একদল মানুষ তাঁকে চিত্রিত করেছে বহুপুরুষের বাহুলগ্না রূপে, বলেছে তাঁর ছ'টি সন্তান ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের। আবার একদল মানুষ তাঁকে চিত্রিত করেছে বিদুষী, ধার্মিক, স্বামী অনুরাগী স্ত্রী এবং রাজ্য পরিচালনায় পারদর্শী নারী হিসেবে। উপন্যাসের শেষে দেখা গেল তিনি তাঁর স্বামীকে ছেড়ে চলে গেছেন। অনেকের কাছে ওটা বড় রহস্য। কেউ বলেছেন পাপীষ্ঠা, পর পুরুষের সঙ্গ লাভ করার উদ্দেশ্যেই নপুংসক স্বামীকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু আসলে তিনি তাঁর স্বামীকে বাঁচানোর জন্যই তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিলেন। পরে যখন বুঝতে পারলেন যে কাজটি ঠিক হয়নি, সর্বাবস্থাতেই স্বামীর সঙ্গে থাকা উচিত ছিল, তিনি প্রাসাদে ফিরতে চেয়েছেন, কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শক্তি তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি।

এবার আখেনাতেন ও নেফারতিতি সম্পর্কে আমরা এমন দু'জন মানুষের কথা শুনব যাদের পরিচয় এ উপন্যাসের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন তে, আখেনাতেনের শাশুড়ি, অর্থাৎ নেফারতিতির সৎ মা, প্রাজ্ঞ আই-এর ৭০ বছর বয়স্ক স্ত্রী। আর আই আখেনাতেনের শিক্ষাগুরু। নেফারতিতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "ও ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমতি এক তরুণী, প্রাণবন্ত এবং আবেগদীপ্ত সৌন্দর্য দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং ধর্মে মরমীয়া দিকগুলোর দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট। বয়সের তুলনায় তাঁকে এত বেশি পরিপক্ক মনে হতো যে আমি একদিন আইকে বলি যে, তোমার এই মেয়ে যাজিকা হবে।" তে-এর সততার আরও প্রমাণ মিলে দু'বোন সম্পর্কে তার বক্তব্য থেকে। "নেফারতিতি আর মুতনেজমেট কখনো কখনো ঝগড়াঝাটি করত, বোনেরা যেমন করে। তবে নেফরাতিতির অবস্থানই সব সময় ঠিক হতো।... সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে মুতনেজমেনেটের সঙ্গে তার ঝগড়া মিটিয়ে ফেলত, বড়ো বোন হিসেবে যা তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল।" এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, পুরোহিত আই যখন তে-কে বিয়ে করেন নেফারতিতি তখন দু'বছরের মেয়ে মাত্র। কিন্তু প্রচলিত বিমাতাদের মতো নেফারতিতির সঙ্গে তিনি কখনোই বিমাতাসুলভ আচরণ করেননি। কিন্তু তারই ঔরসজাত সন্তান মুতনেজমেট, নেফারতিতি এবং আখেনাতেন সম্পর্কে তার মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। এক সঙ্গে এ দু'জন সম্পর্কে তার বক্তব্য আমরা পাই। মেরিয়ামুনকে সে তার বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছে, "আমার স্বীকার করতেই যে হবে যে, আখেনাতেন ছিলেন উন্মাদ, আমাদের সকলের দুর্ভাগ্য যে তিনি মিসরের সিংহাসনের উত্তারাধিকারী হন। এবং অসুস্থ প্রণোদনাসমূহ চরিতার্থ করার জন্য তাঁর ক্ষমতাকে ব্যবহার করেন। আমি বেশি দোষ দিই নেফারতিতিকে, কারণ,

তাঁর মধ্যে বুদ্ধি-যুক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু ও সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগ নিয়ে। আখেনাতেনের ক্ষমতা ও গৌরব মিলিয়ে যেতে না যেতেই সে তাঁকে ত্যাগ করে চলে যায়। সে তাঁর বিরোধীদের সঙ্গে যোগদানের চেষ্টাও করে।... সেও তার ধর্মদ্রোহী, নিষ্কর্মা স্বামীর মতোই নির্বোধ।"

উপন্যাসের শেষ পর্বে মেরিয়ামুন কথা বলেন নেফারতিতির সঙ্গে। হয়তো শেষ কথাটা শুনার জন্য। নেফারতিতি সম্পর্কে লোকমুখে যে সব কথা তিনি শুনে আসছিলেন, সে সব সম্পর্কে চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য। হ্যাঁ, পাঠককে নেফারতিতির সব কথা শোনানোর পর তিনি কোনো মন্তব্য ছাড়াই ইতি টানেন তাঁর গবেষণা বা সাক্ষাৎকার গ্রহণপর্বের। এ উপন্যাসের পাঠক হিসেবে আমরাও একটা ধারণায় পৌঁছতে পারি যে, সুন্দরী নেফারতিনি সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনীগুলোতে যে সব মিথ্যাচার ছড়ানো আছে নাগিব মাহফুজের এ উপন্যাস পাঠের পর সে সব বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে। মি. মাহফুজও হয়তো এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই এমন চমৎকার একটি শৈলীতে এ কাহিনীটিকে উপস্থাপন করেছেন। যাতে উপন্যাসটি সব ধরনের পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। হয়তো এর মাধ্যমে তিনি আখেনাতেন ও নেফারতিতি সম্পর্কে শেষ বার্তাটি বিশ্ববাসীকে দিতে চেয়েছেন।

এখন আমরা আখেনাতেন: সত্যে বসবাসকারী উপন্যাসের মূল বার্তাগুলো খুঁজে দেখব। অসত্য ও অধর্মের যেখানে জয়জয়কার, যেখানে তারা রাজত্ব করে অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে সেখানে অসত্যই সত্য আর অধর্মই গভীর বিশ্বাসরূপে মগজে মগজে প্রোথিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে সেখানে সত্য আর প্রকৃত ধর্মের বাণী যত উত্তমরূপেই পরিবেশিত হোক কেউ তা গ্রহণ করে না, করতে চায় না। সাধারণ মানুষ তখন প্রকৃত সত্যকে সন্দেহের চোখে দেখে, আর তার প্রচারকারীকে পাগল বলে বিদ্রুপ করে। এটা শুধু সত্য আর ধর্মের ক্ষেত্রেই নয় বিশ্বের তাবৎ প্রচলিত ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রচলিত মতে বিশ্বাসী পুরোহিত বা যাজকদের সংখ্যা যেখানে যত বেশি হবে সেখানে সত্যের বা প্রকৃত ধর্মের প্রতিষ্ঠা তত কঠিন হবে। নাগিব মাহ্ফুজের এই উপন্যাস প্রথমত যে বার্তাটি সবচেয়ে জোরালোভাবে তুলে ধরে, তাহলো, প্রচলিত মতের বিশ্বাস যত বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল থাকবে, সে বিশ্বাসকে ভাঙতে গেলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধটাও করতে হয় তত বিধ্বংসী। একজন রাজার পক্ষেও তখন সে যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর জন্য দুর্দর্শী চিন্তার সঙ্গে প্রয়োজন হয় শক্তির, কারণ সুযোগ সন্ধানীদের মোকাবিলার জন্য শক্তিই সবচেয়ে বড়

নিয়ামক। মিথ্যে প্রচারণার দ্বারা তারা ভালোবাসার সুললিত বাণীসমূহকে অর্থহীন তামাশায় পরিণত করে। আর তখন তাদের কাছে নতুন কোনো সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে যাওয়া আত্মঘাতী আচরণ ছাড়া আর কিছু না। তরুণ ফারাও সম্রাট আখেনাতেনের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই, ছিল না মিসরের সাধারণ শান্তকামী মানুষেরও। কিন্তু তবু তাঁর একটা ভুল হয়েছিল। সেটা তাঁর বয়সের কারণেই হোক, জীবন সম্পর্কে তীব্র ধারণার অভাবেই হোক কিংবা তাঁর সিংহাসন বিরোধী মনোভাবের কারেণই হোক। না হলে 'দুষ্টের দমনের জন্য শাস্তির বিধান করতে হয়', এই চরম সত্য ভুলে তিনি বোধহয় ভুলে বসতেন না। তিনি যদি তাঁর শাসনকার্য মাত্র দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন তাহলেই মিসরের ইতিহাসে তিনি হতেন সবচেয়ে জনপ্রিয় সম্রাট। পদক্ষেপ দু'টি হলো, অপরের ধর্মের স্বাধীনতা প্রদান আর অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তি বিধান।

আখেনাতেন : ডয়েলারস ইন ট্রুথ কোন শ্রেণীর উপন্যাস– এমন একটা প্রশ্ন অনেক পাঠকের মধ্যেই জাগতে পারে। এর উত্তর দেয়ার জন্য আমি সালমান রুশদির সাম্প্রতিক একটি বক্তব্যকে টেনে আনতে চাই। 'একটি বই শুধু থ্রিলার হবে না, অথবা হবে না কমেডি, অথবা ঠিক একটি মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস। এটা একই সঙ্গে হবে অনেক চিন্তার সমন্বিত রূপ।' এ বক্তব্য দেয়ার পর রুশদি স্বীকার করেছেন যে এ শিক্ষাটা তিনি পেয়েছেন শেকস্‌পিয়ার থেকে। নাগিব মাহ্‌ফুজের এ উপন্যাসও এমনই জটিল ছাঁচের উপন্যাস। প্রথমেই এটাকে একটি রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ এর পুরো আলোচনাটাই রাজনৈতিক। আবার পুরো গল্পটা যেহেতু ইতিহাসের কাজেই এটাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসও বলা যায়। কিন্তু এর বিশাল আকাশ ছেয়ে আছে দর্শনের জটিল ছেঁড়া মেঘে। একই সঙ্গে এটা একটা রহস্য উপন্যাসও। কারণ কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর শেষ পর্যন্তই মিলে না। যেমন, আখেনাতেনের মৃত্যুর পর যখন তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর ঘোষণা প্রচার করা হলো অনেকেই তা বিশ্বাস করল না। এমনকি, তাঁর স্ত্রী নেফারতিতি নিজেও। উপন্যাসের একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় আমরা এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য পাই। 'আমি ওদের একটা কথাও বিশ্বাস করি নি। আমার প্রিয়তম রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেননি। নিশ্চিন্তভাবে ওরা তাঁকে হত্যা করেছে।' এ বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আমরা উপন্যাসের বহুজায়গায় অপরাপর চরিত্রদের কাছ থেকে পেয়েছি। ওই একই প্রশ্ন আমাদের মনেও জাগে। 'কী হয়েছিল আখেনাতেনের? তাঁকে কি হত্যা করা হয়েছিল? কারা হত্যা করেছিল?' উত্তর পাওয়া যায় না– এমন আরও অসংখ্য প্রশ্ন এ উপন্যাসে রয়েছে যেগুলো পাঠক হৃদয়কে আলোড়িত করে।

উপন্যাসটির মাধ্যমে মি. মাহ্ফুজ আরও দু'টি জোরালো দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। দু'টি প্রশ্নেই চিরন্তনের সুর শুনতে পাওয়া যায়। 'মানুষের বিশ্বাস কি ভেঙে যায় কখনো? ভেঙে যাওয়া বিশ্বাসের স্থান কি নতুন কোনো বিশ্বাস দ্বারা পূরণ হয়? আবার সেই নতুন বিশ্বাসও কি কোনো কারণে ভেঙে যায় না? না যেতে পারে?'

বার বার বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া মানুষেরা যখন একটি সত্যে উপনীত হয়, তখন তারা সম্ভাব্য দু'টি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করে। হয় তারা অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়, অথবা মৃত্যু পর্যন্ত নিজের বিশ্বাসে অটল থাকে। তবে চরম পথটাই বেশির ভাগ মানুষ বেছে নেয়। আর তা হলো, কোনো কিছুতেই বিশ্বাস না রাখা। কিন্তু তাই বলে এই অবিশ্বাসী হয়ে উঠাটাও বিশ্বাসী হয়ে টিকে থাকার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আবার বার বার বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া মানুষ যে পরম অভিজ্ঞতা লাভ করে তা পাথরের মতো শক্ত হলেও হতে পারে কিন্তু তা কখনো পাথরের মতো নিরেট হয় না। কিছু না কিছু সত্যের দ্যুতি ওখান থেকে উৎসারিত হয়। যেমন মেরিয়ামুন যখন আখেনাতেনের শাসন আমলের প্রধান পুলিশ কর্মকর্তার কাছে যান, তার সঙ্গে কথা বলেন, এক পর্যায়ে বড় বিভ্রান্তে পড়েন তিনি। তিনি জানতে চাইলেন, নেফারতিতি কেন রাজাকে একা প্রাসাদে রেখে চলে গেলেন?

মাহো উত্তরে বললেন, এ রহস্য আমি উদ্ধার করতে পারিনি।

: আমার মনে হয় আপনি এখন আর আপনার রাজার দেবতাকে বিশ্বাস করেন না?

: এখন আমি কোনো দেবতাকেই বিশ্বাস করি না।

মাহোর এ বক্তব্যই আমার উপর্যুক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করে। তাই বলা যায়, সেই প্রাচীনকালের ফারাও সম্রাট আখেনাতেনের পরিণতি থেকে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের অনেককিছু শেখার আছে। হাজার হাজার বছর আগের মতোই এখনো এ উপন্যাসের পাঠ সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

আখেনাতেন : ডয়েলার ইন ট্রুথ আরবি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় কায়রো থেকে ১৯৮৫ সালে, লেখক নিজে প্রকাশ করেছিলেন। পরে তাগ্রিদ আবু-হাসাবোর অনুবাদে ১৯৯৮ সালে, কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়। পরে ২০০০ সালে একই অনুবাদকের অনুবাদে তা প্রকাশিত নিউইয়র্ক থেকে। কবীর চৌধুরী এ বাংলা অনুবাদটি করেছেন অনুবাদকের ১৯৯৮ সালের সংস্করণ থেকে। প্রকাশকের অসতর্কতার দরুন বইটিতে শব্দগত কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। এ ব্যাপারটা পীড়াদায়ক বটে। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকাশকদের আরও সতর্কতা অবশ্য বাঞ্ছনীয়।♦